৩

বাংলাদেশের কৃষিখাত

প্রথম ইউনিটের পাঠগুলোর মধ্যে অন্তর্নিহিত যৌক্তিক বন্ধনটি নিম্নরূপ। প্রথমে আমরা পরিচিত হয়েছি বিদ্যমান কৃষিখাতের গঠন বা অবয়বের সঙ্গে। ঐতিহাসিকভাবে এর ক্রমহ্রাসমান গুরুত্বের প্রতিও দৃষ্টিপাত করা হয়েছে প্রথম পাঠে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পাঠে বর্ণনা করা হয়েছে কৃষির বিকাশের ক্ষেত্রে আমাদের দেশের যেসব প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে তাদের ভূমিকা এবং যে ধরনের সামাজিক সম্পর্ক রয়েছে বা পোশাকী ভাষায় যাকে বলা হয় "কৃষির উৎপাদন সম্পর্ক" তার ভূমিকা। তারপরেই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে কৃষিখাতে অর্জিত প্রবৃদ্ধির কার্যকারণ সূত্র। এই প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করার জন্য সরকারী নীতি-কৌশলগুলো কি ছিল এবং এর সীমাবদ্ধতাগুলো উদ্ঘাটিত করা হয়েছে পঞ্চম পাঠে। সর্বশেষ পাঠে "কৃষি প্রশ্নের" বৈপ্লবিক সমাধানের প্রস্তাব "ভূমিসংস্কার ও বর্গসংস্কার" সম্পর্কে খুবই সংক্ষেপে আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠটি হচ্ছেঃ

□পাঠ-১. কৃষি খাতের সংজ্ঞা, প্রবৃদ্ধি ও গুরুত্ব

□পাঠ-২. বাংলাদেশের কৃষিঃ প্রাকৃতিক সম্পদ ভিত্তি

□পাঠ-৩. উৎপাদন সংগঠন

□পাঠ-৪. কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধির চালিকা শক্তি

□পাঠ-৫. কৃষি খাতে সরকারী নীতিমালা

□পাঠ-৬. বাংলাদেশে ভূমি সংস্কার ও কৃষি উন্নয়ন

পাঠ-৩.১ ঃ কৃষি খাতের সংজ্ঞা, প্রবৃদ্ধি ও গুরুত

সাধারণত: কৃষি বলতে আমরা ধান-পাট ইত্যাদি ফসল উৎপাদন বুঝে থাকি। অর্থনীতিতে কৃষিখাত বলতে শুধু ফসল উৎপাদন বোঝায় না। বস্তুত: চার ধরনের উৎপাদন বা চারটি উপখাতের উৎপাদনের সমাহারই হচ্ছে মোট কৃষি উৎপাদন। কৃষি খাতের অন্তর্ভুক্ত এই চারটি উপখাত হচ্ছে যথাক্রমে-

ক. ফসল উপখাত
খ. গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি উপখাত
গ. বন উপখাত
ঘ. মৎস্য উপখাত।

সুতরাং কৃষি উৎপাদন বলতে বিভিন্ন প্রকার ফসল (যেমন-ধান, পাট ইত্যাদি), গরু-ছাগল ইত্যাদি পশুর মাংস ও দুধ, হাঁস-মুরগির মাংস ও ডিম এবং বনের জ্বালানী ও কাঠ এবং সামুদ্রিক ও মিঠা পানির মাছ ইত্যাদি উৎপাদনের সমষ্টি বোঝায়।

গড়ে আমাদের দেশে মোট কৃষি উৎপাদন মূল্যের তিন ভাগের দুই ভাগই আসে ফসল উৎপাদন থেকে।

কৃষির বিভিন্ন উপখাতের উৎপাদন বিন্যাস

কৃষি উৎপাদনে বিভিন্ন উপখাতের অংশ নির্ণয় করে (টাকার মূল্যে হিসাবকৃত) আমরা কৃষি উৎপাদনের কাঠামো বা বিন্যাস নির্ণয় করতে পারি। কোন একটি বছরে প্রতিটি উপখাতে উৎপাদিত উৎপাদনের কাঠামো বা বিন্যাস নির্ণয় করতে পারি। কোন একটি বছরে প্রতিটি উপখাতে উৎপাদিত উৎপাদনের মূল্যের পরিমাণ জানা থাকলে তা খুব সহজেই নির্ণয় করা সম্ভব।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, গড়ে আমাদের দেশে মোট কৃষি উৎপাদন মূল্যের তিন ভাগের দুই ভাগই আসে ফসল উৎপাদন থেকে। বাকি এক তৃতীয়াংশ উৎপাদনে কম বেশি সমান অবদান রাখে অন্য তিনটি উপখাত। অর্থাৎ সমগ্র কৃষি উৎপাদনের ৯ ভাগের ১ ভাগ হিসেবে আসে অন্য ৩টি উপখাত তথা মৎস্য, বন এবং পশু ও হাঁস-মুরগি উপখাত থেকে।

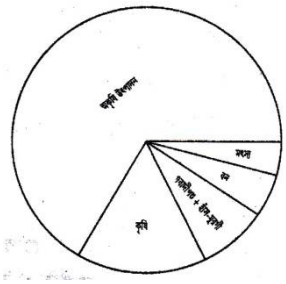

জি.ডি.পি-তে কৃষি উৎপাদনের অংশ এবং কৃষি উৎপাদনের বিন্যাস

কৃষির প্রবৃদ্ধি

৩.১ নং সারণীতে কৃষি খাতের মোট উৎপাদনের গড় প্রবৃদ্ধির হার তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৭৩/৭৪ থেকে ১৯৮৩/৮৪ পর্যন্ত কালপর্বে কৃষি উৎপাদনের গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল বার্ষিক শতকরা ২.৯ শতাংশ। ১৯৮৩/৮৪ থেকে ১৯৯৩/৯৪ পর্যন্ত ও ঐ গড় হার নাটকীয়ভাবে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১.৯ শতাংশ। একই সারণীতে কৃষির অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য উপখাতের গড় প্রবৃদ্ধির হারের হিসাবও তুলে ধরা হয়েছে। সেই হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে যে, প্রথম পর্বে কৃষির অন্তর্ভুক্ত ফসল খাতের প্রবৃদ্ধির হার

ছিল শতকরা ২.১ কিন্তু তা পরবর্তীতে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১.৬ শতাংশ। প্রথম কালপর্বে (১৯৭৩/৭৪-৮৩/৮৪) অন্যান্য উপখাতগুলোর গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে মৎস্য উপখাত ২.৯ শতাংশ, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি উপখাত ১.১ শতাংশ এবং বন উপখাতে ৪.২ শতাংশ। দ্বিতীয় কালপর্বে ফসল ব্যতীত অন্যান্য উপখাতের গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে মৎস্য উপখাত ৩.৭ শতাংশ, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি উপখাত ৩.৪ শতাংশ এবং বন উপখাতে মাত্র ১.৯ শতাংশ।

উপরোক্ত হিসাবমালা থেকে বোঝা যায় যে, ১৯৭৩/৭৪-১৯৮৩/৮৪ এই প্রথম দশকে ফসল উপখাত এবং গবাদিপশু ও হাঁসমুরগি উপখাতের প্রবৃদ্ধির হার ছিল কৃষি উৎপাদনের সামিগ্রিক প্রবৃদ্ধির হারের তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিচে। এই সময় সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল খাত ছিল বন উপখাত। অবশ্য দ্বিতীয় কালপর্বে প্রবৃদ্ধির এই চিত্র নাটকীয়ভাবে বদলে যায়। দ্বিতীয় দশকে (১৯৮৩/৮৪-১৯৯৩/৮৪) কৃষির বিভিন্ন উপখাতের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পেয়েছিল মৎস্য উপখাতের উৎপাদন এবং গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি উপখাতের উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল দ্বিতীয় স্থানে।

সারণী ৩.১ ঃ কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধির হারে (বার্ষিক ও শতাংশ হিসাবে) : ১৯৭৩/৭৪-১৯৯৩/৯৪

খাত/উপখাত	গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার		জি.ডি.পি-র অংশ (%)	
	১৯৭৩/৭৪-৮৩/৮৪	১৯৮৩/৮৪-৯৩/৯৪	১৯৭৩/৭৪-৮৩/৮৪	১৯৮৩/৮৪-৯৩/৯৪
কৃষি	২.৯	১.৯	৫১.০	৩৪.৫
ফসল	২.১	১.৬	৪২.০	২৪.৫
মৎস্য	২.৯	৩.৭	৩.৯	৩.৪
গবাদিপশু+হাঁসমুরগি	১.১	৩.৪	৩.০	৩.৪
বন	৪.২	১.৯	২.১	৩.৪
জি.ডি.পি	৪.২৯	৩.৮	-	-

উৎস্য: ড. মাহাবুব হোসেন এবং কাজী শাহাবুদ্দিন, ১৯৯৭।

দ্বিতীয় কালপর্বে ফসল উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার নেমে যায় একদম সর্বনিম্নে। লক্ষ্যণীয় যে, উভয় কালপর্বেই ফসল উপখাতের প্রবৃদ্ধির হার ছিল কৃষি খাতের সামগ্রিক প্রবৃদ্ধির হারের হারের তুলনায় কম। তবে ফসলখাতের এই নিম্নতর প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও আজও আমাদের কৃষিখাতের বৃহদাংশ জুড়ে রয়েছে ফসল উৎপাদন। তবে ফসল উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে কম হতে থাকলে কৃষি উৎপাদনে অন্যান্য উপখাতের অংশ (Share) ক্রমশ: বৃদ্ধি পাবে। ফলে কৃষি উৎপাদনের বৈচিত্র্য (Diversity) বৃদ্ধি পাবে এবং এ ধরনের পরিবর্তন কাম্যও বটে। কিন্তু ফসল উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার খুব বেশি হ্রাস পেলে, বিশেষত: তা যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়েও নিচে নেমে যায়, তাহলে তা শুভ সংবাদ নাও হতে পারে। কারণ তখন খাদ্যশস্যের মাথা-পিছু প্রাপ্যতা অক্ষুন্ন রাখার জন্য আমাদেরকে বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হবে যেটা কাম্য নাও হতে পারে। কারণ এখনো আমাদের প্রধান দুই খাদ্যশস্য ধান ও গম ফসল উৎপাদন উপখাত থেকেই আসে।

ফসল উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে কম হতে থাকলে কৃষি উৎপাদনে অন্যান্য উপখাতের অংশ ক্রমশ: বৃদ্ধি পাবে। ফলে কৃষি উৎপাদনের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পাবে এবং এ ধরনের পরিবর্তন কাম্যও বটে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি খাতের গুরুত্ব

৩.১ নং সারণীতে প্রদত্ত হিসাব থেকে আমরা দেখতে পাই যে, আলোচ্য দুই দশকে কৃষি খাতের গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২.৯ শতাংশ, কিন্তু দ্বিতীয় দশকে তা কমে দাঁড়ায় ১.৯ শতাংশ। আগের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, এই দুই দশকে আমাদের জি.ডি.পি'র প্রবৃদ্ধির গড় প্রবণতা চার শতাংশের পাশেই ওঠানামা করেছে। সেই হিসেবে বলা যায় যে, এই দুই দশক জুড়েই সমগ্র অর্থনীতিতে কৃষির প্রবৃদ্ধির হার ছিল তুলনামূলকভাবে নিম্নতর। ফলে এ কথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, জি.ডি.পি'তে কৃষি অংশ (Share) এই দুই দশক ব্যাপী সময়ে ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছিল। তালিকায় প্রদত্ত তথ্য থেকে এই যুক্তির পক্ষে সন্দেহাতীত সমর্থন পাওয়া যায়। ১৯৭৩/৭৪ সালে জি.ডি.পি-তে কৃষি উৎপাদনের অংশ ৫১ শতাংশ থাকলেও, তা ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে ১৯৯৩-৯৪ সালে মাত্র ৩৪.৫ শতাংশে পরিণত হয়েছিল। বস্তুত: ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত কৃষির অংশ জি.ডি.পি-তে কমলেও তা কমেছিল অপেক্ষাকৃত শ্লথ গতিতে। ১৯৮৫-র পর থেকে কৃষির প্রবৃদ্ধির হারে ধস নামে এবং সেই সাথে জি.ডি.পি-তে কৃষির অংশও দ্রুত কমে যায়। পরিকল্পনা কমিশন দপ্তর থেকে সর্বশেষ হিসাবকৃত তথ্যের ভিত্তিতে ভিত্তিতে প্রণীত ৩.২ নং সারণীতে জি.ডি.পি-তে কৃষির ক্রমঅবনতিশীল অংশের প্রামণ্য চিত্র তুলে ধরেছে। পাশাপাশি পঞ্চম পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষে অর্থাৎ ২০০২ সালে জি.ডি.পি-তে কৃষির অংশ যে আরও নেমে গিয়ে মাত্র ২০ শতাংশে পরিণত হতে পারে সেই সম্ভাবনার কথাও সারণীতে ব্যক্ত হয়েছে। (দেখুন সারণী ৩.২)

১৯৮৫ সাল পর্যন্ত কৃষির অংশ জি.ডি.পি-তে কমলেও তা কমেছিল অপেক্ষাকৃত শ্লথ গতিতে। ১৯৮৫-র পর থেকে কৃষির প্রবৃদ্ধির হারে ধস নামে এবং সেই সাথে জি.ডি.পি-তে কৃষির অংশও দ্রুত কমে যায়।

সাধারণভাবে যে কোন বিকাশমান অর্থনীতিতে প্রথমে কৃষির আপেক্ষিক অবদান হ্রাস পেতে থাকে এবং ক্রমশ: শিল্পের ও আরো পরে সেবা খাতের আপেক্ষিক অবদানই প্রধান অবদানে পরিণত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অবশ্য আমরা কৃষি খাতের অবদানের ক্রম অবনতি লক্ষ্য করলেও, শিল্পায়নে তেমন একটা অগ্রগতি লক্ষ্য করি না। বরং বাংলাদেশে বর্তমানে কৃষিখাতের অবনতি এবং সেবা খাতের প্রবৃদ্ধিই প্রধান প্রবণতা হিসেবে আবির্ভুত হয়েছে। সাধারণভাবে সমগ্র অর্থনীতিতে কৃষির ক্রমহ্রাসমান গুরুত্বের জন্য প্রধানত তিনটি অর্থনৈতিক কারণকে দায়ী করা যায়-

ক. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম উৎপাদন উপাদান জমির সরবরাহ সসীম বিধায় কৃষি উৎপাদন অন্যান্য উৎপাদনের মত অবাধে বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়।

খ. কৃষি উৎপাদনের চাহিদা জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমহারে বৃদ্ধি পায় না। কারণ কৃষি পন্যের চাহিদা আয়-অস্থিতিস্থাপক।

গ. অকৃষি খাতের উৎপাদনশীলতা এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত কৃষিখাতের তুলনায় বেশি এবং বেশি হারে বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং সমগ্র অর্থনীতিতে অকৃষি খাতের তুলনায় কৃষি খাতের ক্রমহ্রাসমান গুরুত্ব অর্থনৈতিক কারণেই অনিবার্য।

কিন্তু শ্লথ হলেও কতটুকু শ্লথ বা বাংলাদেশের জন্য কৃষি খাতের ইপ্সিত প্রবৃদ্ধির হার কত এই প্রশ্ন থেকে যায়। যেহেতু এখনো পর্যন্ত আমাদের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ২ শতাংশের কাছাকাছি রয়ে গেছে, সেজন্য খাদ্য শস্যের ও অন্যান্য কৃষি পণ্যের মাথাপিছু প্রাপ্যতা অন্তত: বর্তমান পর্যায়ে রাখতে হলেও আমাদের দেশে কৃষি খাতের উৎপাদন ন্যূনতম ২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি করতে হবে। তদুপরি। অপ্রত্যক্ষভাবে কৃষি খাতের অন্য অনেক উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে যেগুলো সহসা বা দ্রুত হ্রাস পেলে দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হতে পারে।

সারণী ৩.২ ঃ কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধি এবং জি.ডি.পি-তে কৃষি খাতের অংশ

বছর	কৃষির গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার %	জি.ডি.পি-তে কৃষির অংশ (%)
১৯৭৩-৭৮	৪.৯	৫৭
১৯৭৮-৮০	৩.১	৫২
১৯৮০-৮৫	৩.৫	৫১
১৯৮৫-৯০	১.৭	৩৯
১৯৯১-৯৫	০.৯৮	৩২.৮
১৯৯৫-৯৬	৩.৭	৩১.৯
১৯৯৬-৯৭	৬.০	৩২.৪
১৯৯৭-২০০২	৪	২৫.৫

টীকা: ১৯৯৭-২০০২ সালের প্রদত্ত তথ্যটি অনুমান ভিত্তিক (Provisional)।

আমাদের মনে রাখা উচিত যে, এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের জি.ডি.পি'র প্রায় এক তৃতীয়াংশ আসে কৃষি থেকে। বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের প্রায় এক তৃতীয়াংশ কৃষি নির্ভর। তৈরি পোশাক শিল্পের অভ্যুদয়ের আগে এক্ষেত্রে কৃষির অবদানই ছিল প্রধান অবদান। বাংলাদেশের অর্ধেকেরও বেশি লোক বা পরিবার কৃষি ভিত্তিক আয়ের উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে। সুতরাং কৃষির ন্যূনতম প্রবৃদ্ধি ব্যতীত, বাংলাদেশের সমগ্র অর্থনীতির উচ্চতর প্রবৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা অক্ষুন্ন রাখা সম্ভব হবে না।

সারসংক্ষেপ

কৃষি খাত মোট ৪টি উপখাতের সমন্বয়ে গঠিত ঃ ফসল উপখাত, মৎস্য উপখাত, গবাদি পশু ও হাঁসমুরগি উপখাত এবং বন উপখাত। গড়ে কৃষি উৎপাদনের দুই তৃতীয়াংশ আসে ফসল উপখাত থেকে। বাকি এক তৃতীয়াংশ উৎপাদন মোটামুটি সমান হারে অন্য তিনটি উপখাত থেকে আসে। মধ্য আশির দশক পর্যন্ত আমাদের কৃষির প্রবৃদ্ধির হার ছিল প্রায় ৩ শতাংশ। কিন্তু পরবর্তী দশকে কৃষির প্রবৃদ্ধির হার আশংকাজনক হারে হ্রাস পায় (দুই শতাংশ)। তবে সমগ্র কালপর্ব জুড়েই কৃষির প্রবৃদ্ধির হার ছিল সমগ্র জি.ডি.পি'র প্রবৃদ্ধির তুলনায় কম। ফলে এই সময় অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব স্বাভাবিক কারণেই ক্রমশ: হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু এর পরেও সর্বশেষ হিসাবানুসারে আমাদের সমগ্র জি.ডি.পি'র প্রায় এক পঞ্চামাংশ আসছে কৃষি থেকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন।

১. কৃষি খাত মোট-

ক. একটি উপখাতের সমন্বয়ে গঠিত; খ. ৩টি উপখাতের সমন্বয়ে গঠিত;

গ. ৪টি উপখাতের সমন্বয়ে গঠিত।

২. ১৯৭৩-৭৪ থেকে ১৯৮৩-৮৪ এই কালপর্বে কৃষির প্রবৃদ্ধির হার ছিল-

ক. তিন শতাংশ; খ. এক শতাংশ; গ. ১.৫ শতাংশ।

৩. ১৯৭৩-৭৪ থেকে ১৯৮৩-৮৪ এই কালপর্বে কৃষি খাতের মধ্যে সবচেয়ে বর্ধিষ্ণু উপখাত ছিল-

ক. ফসল উপখাত; খ. গবাদিপশু ও হাঁসমুরগী উপখাত;

গ. মৎস্য উপখাত: ঘ. বন উপখাত।

৪. ১৯৮৩-৮৪ থেকে ১৯৯৩-৯৪ এই কাল পর্বে কৃষি খাতের মধ্যে সবচেয়ে বর্ধিষ্ণু উপখাত ছিল-

ক. ফসল উপখাত; খ. গবাদি ও হাঁসমুরগী উপখাত;

গ. মৎস্য উপখাত; ঘ. বন উপখাত।

৫. বর্তমানে জি.ডি.পি'তে কৃষি খাতের অংশ হচ্ছে-

ক. ৫০ শতাংশ; খ. ৩৫ থেকে ৪৫ শতাংশ; গ. ৩৫ শতাংশের কম।

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. "অকৃষি খাতের তুলনায় কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধির হার অপেক্ষাকৃত শ্লথ হতে বাধ্য"-ব্যাখ্যা করুন।

২. বাংলাদেশের কৃষি খাতের ইপ্সিত প্রবৃদ্ধির হার কত হওয়া উচিত? উত্তরের পক্ষে আপনার যুক্তি দিন।

৩.২ ঃ বাংলাদেশের কৃষি : প্রাকৃতিক সম্পদ ভিত্তি

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- বাংলাদেশে জমির পরিমাণ কতটুকু, এর কতটুকু আবাদী জমি, আবাদ ছাড়া অন্যান্য কি কি কাজে জমি ব্যবহৃত হচ্ছে;
- সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মাথা পিছু আবাদযোগ্য জমির প্রাপ্যতা কিভাবে হ্রাস পাচ্ছে, ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর;
- বাংলাদেশের জলসম্পদের পরিমাণ, উৎসমূহ এবং প্রয়োজনের তুলনায় প্রাপ্যতার বিশ্লেষণমূলক আলোচনা।
- বাংলাদেশের কৃষির নিত্য-নৈমিক্তিক সমস্যা খরা ও বন্যার কালানুক্রমিকতার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা;
- ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপের ফলে বাংলাদেশের সামগ্রিক পরিবেশ ও কৃষি উৎপাদনের উপর যেসব সম্ভাব্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে তার বিবরণ।

প্রাকৃতিক সম্পদ ভিত্তি

কৃষির প্রাকৃতিক সম্পদ ভিত্তি প্রধানত: তিন প্রকার

ক. জমি

খ. জল

গ. আবহাওয়া ও জলবায়ু।

অন্যান্য অকৃষিজ উৎপাদনের তুলনায় কৃষি উৎপাদনের প্রাকৃতিক ভিত্তি অপেক্ষাকৃত প্রত্যক্ষ এবং গভীর। বস্তুত: কৃষি উৎপাদন প্রাকৃতিক উপাদানের দ্বারা যতখানি প্রভাবিত হয়, শিল্প বা ব্যবসা বাণিজ্য তত নয়।

জমি ঃ প্রকারভেদ ও ব্যবহার

বাংলাদেশের মোট জমির পরিমাণ ১৪.৩ মিলিয়ন হেক্টর। এর মধ্যে ১৫ শতাংশ হচ্ছে বনভূমি এবং ২০ শতাংশ হচ্ছে পানি ও আবাসস্থল। সুতরাং বাংলাদেশের মোট জমির প্রায় ৩৫ শতাংশ আবাদযোগ্য নয়। অর্থাৎ বাংলাদেশের মোট জমির ৬৫ শতাংশ বা প্রায় ৯ মিলিয়ন হেক্টর জমি হচ্ছে আবাদযোগ্য বা এমন জমি যেখানে ইচ্ছা করলে চাষ করা সম্ভব। এক হিসাবে দেখা যায় যে, এই ৯ মি. হেক্টর আবাদযোগ্য জমির মধ্যে ৮.৭ মি. হেক্টর জমি ইতোমধ্যেই আবাদের অধীনে চলে এসেছে। সুতরাং বাংলাদেশের আবাদযোগ্য জমির ৯.৭ শতাংশই বর্তমানে আবাদের অধীনে আছে। সহজেই অনুমেয় যে, বাকি যে ৩ শতাংশ অনাবাদী আবাদযোগ্য জমি রয়েছে তার উপর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ ক্রমশ: আরো বৃদ্ধি পাবে। তাই এর ফলে এসব জমির আবাদের অধীনে আসার সম্ভাবনা খুবই কম। বরং বাসস্থান, শিল্প -বানিজ্য ইত্যাদির প্রসারের জন্যই এই অনাবাদী জমি ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এমন কি জনসংখ্যা খুব বেশি বৃদ্ধি পেলে বনভূমি ও আবাদী ভূমির অংশ বিশেষও বাসস্থান ও শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে।

বাংলাদেশে মোট জমির ৬৫ শতাংশ বা প্রায় ৯ মিলিয়ন হেক্টর জমি হচ্ছে আবাদযোগ্য বা এমন জমি যেখানে ইচ্ছা করলে চাষ করা সম্ভব।

বস্তুত: ১৯৫০-৫১ সালে আবাদকৃত জমির পরিমাণ ছিল ৮.২৯ মি. হেক্টর। ১৯৬৯-৭০ সালে সেই পরিমাণটি বেড়ে হয়েছিল ৮.৭ মি: হেক্টর। কিন্তু তারপর থেকে বাংলাদেশের আবাদকৃত জমির পরিমাণ (Cultivated) আর বৃদ্ধি পায় নাই। কৃষিবিদগণ ধারণা করেন যে, বর্তমানে বাংলাদেশের আবাদকৃত জমি ৮.৭ মি. হেক্টরের চেয়ে কম বই বেশি হবে না।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, আবাদকৃত বা আবদযোগ্য জমি একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর কোন দেশেই খুব একটা বৃদ্ধি করা যায় না। প্রাকৃতিকভাবে দেশের ভৌগলিক সীমানা দ্বারা তা পূর্ব নির্ধারিত

জমির ঘাটতি মোকাবেলার একটি সম্ভাব্য পথ হচ্ছে চাষের তীব্রতা বৃদ্ধি করা।

থাকে। এমতাবস্থায় ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য স্থানীয়ভাবে খাদ্য যোগ্যতা হলে একমাত্র কৌশল হচ্ছে একই জমি একাধিকবার আবাদ করা। এক একর জমি বছরে তিন বার চাষ করা হলে আমরা প্রকৃত পক্ষে একবার চাষ করা হচ্ছে একরকম ৩ একর জমির প্রায় সমান উৎপাদন পেতে পারি। সুতরাং জমির ঘাটতি মোকাবেলার একটি সম্ভাব্য পথ হচ্ছে চাষের তীব্রতা বৃদ্ধি করা। বাংলাদেশের কৃষি জমির চাষ তীব্রতা স্বাধীনতার আগে ১৯৬৯-৭০ সালে ছিল মাত্র ১.৫১ অর্থাৎ প্রচলিত ভাষায় গড়ে আমাদের আবাদকৃত জমিগুলো ছিল দেড়-ফসলী। স্বাধীনতার পরপর তা কমে দাঁড়ায় ১.৪২। ধীরে ধীরে তা আবার বাড়তে থাকে এবং ১৯৮০-৮১ সালে ১.৫৪ এ পরিণত হয়। অর্থাৎ স্বাধীনতার আগের অবস্থায় উপনীত হয়। এরপর থেকে তা ক্রমাগত একনাগারে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯০-৯১ সালে ১.৭২ এ পরিণত হয়। বর্তমানে চাষ তীব্রতার পরিমাণ প্রায় ১.৭৫। ৩.৩ ন ং সারণীতে চাষ তীব্রতার ও জলসেচের কালানুক্রমিক চিত্র তুলে ধরা হল। প্রধানত: শুষ্ক মওসুমে জল সেচের ব্যবস্থা করেই বাংলাদেশে কৃষি জমির চাষ তীব্রতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

সারণী ৩.৩ ঃ বাংলাদেশের কৃষির গড় চাষ-তীব্রতা ঃ কালানুক্রমিক চিত্র

বছর	গড় চাষ তীব্রতা	সেচায়িত জমি (আবাদী জমির শতাংশ হিসেবে)
১৯৬৯-৭০	১.৫১	৩.৮
১৯৭২-৭৩	১.৪২	১২.৩
১৯৭৬-৭৭	১.৪৮	১৬.৯
১৯৮০-৮১	১.৫৪	১৮.৬
১৯৮৪-৮৫	১.৫৪	১৯.৭
১৯৮৮-৮৯	১.৬৮	৩২.৯
১৯৯০-৯১	১.৭২	৩৫.৫
১৯৯৮-৯৯	১.৭৪	৪৮.৩(১৯৯৬)

উৎস্য: বি.বি.এস ষ্ট্যাটিষ্টিকাল পকেট বুক, বিভিন্ন সংখ্যা।

জল ঃ উৎস ও ব্যবহার

বাংলাদেশের জলসম্পদ সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্যভিত্তিক আলোচনার আকর গ্রন্থ হচ্ছে " National water plan Project-Final Report" এই গ্রন্থভুক্ত তথ্যাবলী ব্যবহার করে নিচের আলোচনা প্রস্তুত করা হয়েছে।

বাংলাদেশে জলের উৎস প্রধানত: দুই ধরনের-

ক. উপরিতলের জলসম্পদ: এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ইত্যাদি নদ-নদী- খাল-বিল, শাখা নদী, পুকুর, ডোবা এমন সকল জলের আধার যা মাটির উপরে দৃশ্যমান।

খ. ভূগর্ভস্থ জলসম্পদ: এর অবস্থান হচ্ছে মাটির নিচে যেহেতু বাংলাদেশের ভুতাত্ত্বিক গঠন মরুপ্রধান বা পাহাড়ী নয় এবং বাংলাদেশের জলবায়ু মৌসুমী বৃষ্টিতে ভরপুর এবং সর্বোপরি এর উপর দিয়ে বয়ে গেছে হিমালয় থেকে আগত অসংখ্য নদ-নদী ও তাদের শাখা-প্রশাখা। সেহতু বাংলাদেশের মাটির গভীরে অল্প কিছু খুঁড়লেই পানির সন্ধান পাওয়া যায়। সাধারণত: বাংলাদেশের বেশিরভাগ অঞ্চলে ৬ মিটার গভীর গর্ত খুঁড়লেই ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তবে উত্তরাঞ্চলে কোথাও কোথাও ভুগর্ভস্থ পানির স্তর ১২ মিটারের কম

গভীরতায় খুঁজে পাওয়া যায় না। এইজন্যই উত্তরাঞ্চল ও বরেন্দ্র অঞ্চলে অগভীর নলকূপের বদলে গভীর নলকুপের প্রচলন বেশি।

বাংলাদেশে জলের মোট প্রাপ্যতা মৌসুম ভেদে পরিবর্তনশীল। বর্ষা মওসুমে প্রচুর বৃষ্টিপাত এবং নদীর পানি প্রবাহ বৃদ্ধির কারণে জলের প্রাপ্যতা অবাঞ্চিত পরিমাণে বেড়ে যায়। তখন পানির আধিক্যই একটি সমস্যায় পরিণত হয়। অথচ গ্রীষ্মকালে বা শীতকালে শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রাপ্যতা এত কমে যায় যে, কোথাও কোথাও কোন কোন বছর খরার প্রাদুর্ভাব ঘটে। জলের প্রাপ্যতার এই ওঠানামা তথা বন্যা ও খরার পারস্পর্য বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে থাকে।

এক হিসাবে দেখানো হয়েছে যে, আগস্ট মাসে বাংলাদেশের উপরিতলের জলাধারাগুলো বিশেষত: প্রবাহমান নদ-নদী ও তাদের শাখা-প্রশাখাগুলোতে পানি প্রবাহের গড় পরিমাণ দাঁড়ায় সর্বোচ্চ ১০২০০০ কিউবিক মিটার/সেকেন্ড। হিসাবানুসারে দেখা যাচ্ছে পানি প্রবাহের অনুপাত (বর্ষা মৌসুম বনাম শুষ্ক মৌসুম হচ্ছে ১৪.৪০ ঃ ১.০০)।

বাংলাদেশে জলের মোট প্রাপ্যতা মৌসুম ভেদে পরিবর্তনশীল। বর্ষা মওসুমে প্রচুর বৃষ্টিপাত এবং নদীর পানি প্রবাহ বৃদ্ধির কারণে জলের প্রাপ্যতা অবাঞ্চিত পরিমাণে বেড়ে যায়।

যেহেতু শুষ্ক মৌসুমে উপরিতলের পানি (Surface water) প্রায় ১৫ গুণ হ্রাস পেয়ে থাকে। সেহেতু এই মৌসুমে মানুষ প্রধানত: ভুগর্ভস্থ পানির উপর নির্ভর করে থাকে। বাংলাদেশে শুষ্ক মৌসুমে বৃষ্টি কম হওয়ার কারণে সাধারণভাবে কৃষি খাতে জলসেচের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। স্বভাবত:ই প্রশ্ন উঠে বাংলাদেশে শুষ্ক মৌসুমে ভূ-গর্ভে যে সঞ্চিত পানি রয়েছে তা বৃষ্টিপাতে জলসেচের চাহিদা মেটানোর জন্য আদৌ যথেষ্ট কি না?

এক হিসাবে জানা যায় যে, শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশে উপরিতলের প্রাপ্য জলের মজুত হচ্ছে গড়ে ১১১৫ মি: কিউবিক ফুট। এর মধ্যে ৪৫ শতাংশ মজুত রয়েছে উপরিতলের নদনদীগুলোতে এবং ৫৫ শতাংশ মজুদ রয়েছে স্থির জলাধারগুলোতে (যেমন পুকুর, বিল ইত্যাদি)।

পুকুর বা নদীর পানি ব্যবহার করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। কারণ এর জন্য দরকার ড্রেইন খনন বা দীর্ঘ নল যুক্ত পাম্প ইত্যাদি। সেজন্য শুষ্ক মৌসুমে কৃষকেরা বর্তমানে প্রধানত: ভূগর্ভস্থ পানি অগভীর ও গভীর নলকূপের সাহায্যে জলসেচের জন্য ব্যবহার করতে বেশি আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। এক হিসাবে জানা যায় যে, মার্চ মাসে ভূগর্ভে জলের মজুদ দাঁড়ায় ২৪.৪১৫ কি: কিউবিক মিটার। ১৯৮৪-৮৫ সালে এই পানির মাত্র ২০ শতাংশ ব্যবহার করে বাংলাদেশের মোট আবাদী জমির ২১ শতাংশ জলসেচের অধীনে আনা সম্ভব হয়েছিল। সেই হিসাবে অনুমান করা হয় যে, শুষ্ক মৌসুমে আমাদের দেশের ভূগর্ভে যে প্রাপ্য পানি রয়েছে তার সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করলে আমরা আমাদের দেশের প্রায় ৬.৯ মি: হেক্টর আবাদী জমিকে জলসেচের অধীনে আসতে সক্ষম হব। অর্থাৎ প্রাপ্য ভূগর্ভস্থ জলসম্পদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের মোট আবাদী জমির ৮০ শতাংশই জলসেচের অধীনে নিয়ে আসা সম্ভব। কিন্তু এরকম অতি ব্যবহারের নানা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রয়েছে।

শুষ্ক মৌসুমে আমাদের দেশের ভূগর্ভে যে প্রাপ্য পানি রয়েছে তার সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করলে আমরা আমাদের দেশের প্রায় ৬.৯ মি; হেক্টর আবাদী জমিকে জলসেচের অধীনে নিয়ে আসতে সক্ষম হব।

বাংলাদেশের কৃষির একটি সমস্যা পানির স্বল্পতা ও খরা। আরেকটি সমপরিমাণ বা ততোধিক বড় সমস্যা হচ্ছে বন্যা। বর্ষা মৌসুমে বাংলাদেশের আবাদী জমির একটি বড় অংশ পানির তলে তলিয়ে যায়। ফলে সেসব জমিতে, বিশেষত: গভীর বন্যাক্রান্ত জমিতে বর্ষা মৌসুমে কোন আবাদ সম্ভব হয় না। অবশ্য এ ধরনের জমিতে কোথাও কোথাও গভীর পানির ধান (Deep water rice) এর সীমিত আবাদ হয়ে থাকে। ৩.৪ নং সারণীতে বাংলাদেশের আবাদী জমির উচ্চতা অনুসারে বন্যার প্রকোপের চিত্র তুলে ধরা হল। উপরোক্ত তালিকার তথ্য থেকে এটুকু বলা যায় যে, বাংলাদেশের

আবাদী জমির মাত্র ৩৭ শতাংশ মোটামুটিভাবে সারা বছর বন্যামুক্ত থাকে। প্রায় অর্ধেক আবাদীজমি বিশেষ মৌসুমে বন্যাক্রান্ত হয় এবং ১৩ শতাংশ জমি গভীর বন্যার কবলে পতিত হয়।

সারণী ৩.৪ ঃ আবাদী জমির উচ্চতা অনুসারে বন্যার গভীরতা

নং	জমির উচচতা অনুযায়ী জমির ধরণ	বন্যার গভীরতা	বন্যার স্থায়ীত্ব	আবাদী জমির পরিমাণ (শতাংশ)
১.	উঁচু জমি	১ ফুটের চেয়ে কম গভীর	স্বল্পকালীন	৩.৫১৪ মি:হে: (৩৭)
২.	মাঝারি উঁচু জমি	১ থেকে ৩ ফুট গভীর	এক মৌসুম বা মৌসুমের বেশির ভাগ সময়।	৩.২৮৮মি:/হে: (৩৪)
৩.	মাঝারি নিচু জমি	৩ থেকে ৫.৫ ফুট	ঐ	১.৫৫৮মি:/হে: (১৬)
৪.	নিচু জমি	৬ ফুট+	ঐ	১.১২৪মি:/হে: (১২)
৫.	খুবই নিচু জমি	৬ফুট++	প্রায় সারা বছর	০.৭৮ মি:/হে: (১)

উৎস্য: সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়, ১৯৮৬।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ ও পরিবেশ দুষণের সম্ভাবনা

বাংলাদেশের জনসংখ্যার যেসব প্রক্ষেপণের (Projection) হিসাব আমরা আগে উল্লেখ করেছি তাতে দেখা যায় যে, ২০২০ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দাঁড়াবে ১৭ কোটি। আর ২০৩০ সালে তা হবে ১৮ কোটি ৬০ লক্ষ। অবশ্য শেষ হিসাবানুযায়ী ২০১১ সালে মোট জনসংখ্যা হয়েছে ১৪ কোটি ৯৮ লক্ষ। সুতরাং আমাদের প্রাপ্য সীমিত আবাদী জমি যা আরো কমবে বই বাড়বে না এবং প্রাপ্য সীমিত জল ব্যবহার করেই এই প্রায় ১৮ কোটি লোকের খাদ্য চাহিদা কৃষিকে পূরণ করতে হবে। সুতরাং জমি ও জলসম্পদের উপর চাহিদার পরিমাণ বেড়ে যাবে এবং তাদের অত্যাধিক ব্যবহারের কারণে নানারকম বিরূপ পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। এ ব্যাপারে পরিবেশবিদরা ইতোমধ্যেই আমাদেরকে কতিপয় উদীয়মান সমস্যার ব্যাপারে সজাগ করে দিয়েছেন। এগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিচে দেয়া হল-

বর্তমান বাংলাদেশের বেশিরভাগ আবাদী জমিতে দস্তা এবং গন্ধকের এর ঘাটতি দেখা দিয়েছে। চাষীরা ভারসাম্যপূর্ণ স্যার ব্যবহার না করে ইউরিয়ার দিকে অত্যাধিক ঝুঁকে পড়ায় এই সমস্যা আরো তীব্রতর হচ্ছে।

১. জমির উর্বরতা হ্রাস- ক্রমাগত একই জমি বিরামহীনভাবে ও ঘনঘন চাষ করলে জমির স্বাভাবিক উর্বরতা হ্রাস পায়। ইউরিয়া, টি.এস.পি, এম.পি এবং গোবার সার ব্যবহার করে বর্তমানে চাষীরা এই স্বাভাবিক উর্বরতা ক্ষয়কে কিছু পরিমাণে পূরণের প্রয়াস পান। কিন্তু এক হিসাবে দেখা গেছে যে, এসব কৃত্রিম সার প্রয়োগের মাধ্যমে হৃত উর্বরতার মাত্র ১০ শতাংশ পুনরায় প্রতিস্থাপন করা সম্ভব, বাকি ৯০ শতাংশ ঘাটতি থেকেই যায়। বিশেষত: বর্তমানে বাংলাদেশের বেশির ভাগ আবাদী জমিতে (Zinc) এবং গন্ধকের (Sulphur) এর ঘাটতি দেখা দিয়েছে। চাষীরা ভারসাম্যপূর্ণ সার ব্যবহার না করে ইউরিয়ার দিকে অত্যাধিক ঝুঁকে পড়ায় এই সমস্যা আরো তীব্রতর হচ্ছে।

২. বন্যা-নিয়ন্ত্রণ বাঁধ: বন্যা-নিয়ন্ত্রণ বাঁধ দিয়ে স্বাভাবিক পানি প্রবাহ ঠেকিয়ে দেয়ার জন্য বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই বাঁধের ভেতরে বৃষ্টির পানি জমে নানা সমস্যার সৃষ্টি করছে। তাছাড়া বাঁধের মাধ্যমে স্বাভাবিক প্রবাহ আটকে যাওয়ায় নদ-নদীতে মাছের পরিমাণ হ্রাস

পাচ্ছে। তদুপরি অতিরিক্ত মাছ ধরার কারণেও (Over fishing) যে হারে মাছ ধরা হচ্ছে, সে হারে মাছের বংশবৃদ্ধি হচ্ছে না।

৩. বন-উজাড়: বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে জনগণ সাধারণত: বনের গাছ কেটে বসত গড়ে তোলায় অথবা তা কাঠ বা লাকড়ি হিসেবে ব্যবহার করায় বাংলাদেমের বনাঞ্চলের আয়তন ক্রমশ: হ্রাস পাচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি সঙ্গে সঙ্গে এসব চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং বন-উজারের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া জ্বালানীর উৎস হিসেবে বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে বন্যা গাছ-গাছালি, খড়ি, ফসলের আগাছা ও নাড়া এবং ঘুটে ক্রমবর্ধমান হারে ব্যবহার হচ্ছে। বিশেষত: দরিদ্র মানুষেরাই এগুলো জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু এই সব জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত না হত তাহলে এগুলো মাটিতে থেকে মিশে গিয়ে আমাদের ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধিতে জৈবনিক সার (Organic Fertilizer) হিসেবে উপকারী ভূমিকা বা অবদান রাখতে সক্ষম হত।

৪. গোচারণভূমি বনভূমি উজারের পাশাপাশি খড়-আগাছার জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার এই দুই প্রক্রিয়া যুগপৎভাবে বাংলাদেশে পশু-খাদ্যের সংকট সৃষ্টি করেছে। ফলে গবাদী পশু উপখাতে উৎপাদন বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের কৃষির প্রাকৃতিক সম্পদ ভিত্তি প্রধানত: তিন প্রকার-জমি, জল ও জলবায়ু। কৃষি উৎপাদন যেহেতু প্রধানত: একটি প্রাকৃতিক জীবন প্রক্রিয়া সেজন্য এর গতি প্রকৃতি সংশ্লিষ্ট দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ভিত্তির উপর গভীরভাবে নির্ভরশীল। বাংলাদেশের মোট জমির আয়তন ১৪.৩ মিলিয়ন হেক্টর। এই জমির পরিমাণ আর বাড়বে বলে মনে হয় না। অবশ্য বঙ্গোপসাগরে নতুন ব-দ্বীপ তৈরি হলে এবং তা বাংলাদেশের সমুদ্র সীমানার মধ্যে পড়লে তা হলেও হতে পারে। বাংলাদেশের মোট আবাদী জমি বর্তমানে ৮.৭ মি: হেক্টর। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপের কারণে আবাদযোগ্য মোট জমি ক্রমশ: কমবে বৈ বাড়বে না। ফলে বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা মিটানোর জন্য একই জমিতে ক্রমাগত অধিকতর খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে হচ্ছে বাংলাদেশকে। এর একটি পদ্ধতি হচ্ছে জলসেচের দ্বারা এক ফসলী জমিকে দুই ফসলী এবং দুই ফসলী জমিকে তিন ফসলী জমিতে রূপান্তরিত করা। বর্তমানে বাংলাদেশের আবাদী জমির গড় চাষ তীব্রতা হচ্ছে ১.৭২। সাধারণভাবে বাংলাদেশের জলসম্পদের অভাব নেই। বস্তুত: বাংলাদেশকে বলাই হয় নীদমাতৃক বাংলাদেশ। কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে, মৌসুম ভেদে এই জলসম্পদের ভূমিকা বদলে যায়। বর্ষা মৌসুমে জলসম্পদের আধিক্য বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি করে এবং শুষ্ক মৌসুমে প্রয়োজনের তুলনায় সহজলভ্য পানির অভাব দেখা যায়। তবে ভূগর্ভের পানি ঠিকমত ব্যবহার করলে এমনকি শুষ্ক মৌসুমেও বাংলাদেশের শতকরা আশি ভাগ আবাদী জমিকে জলসেচের অধীনে আনা সম্ভব। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপের কারণে বাংলাদেশে নানারকম পরিবেশগত দূষণ সৃষ্টি হচ্ছে। এর মধ্যে কৃষি সংশ্লিষ্ট উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া বা পরিবেশ দূষণগুলো হচ্ছে-জমির উর্বরতা হ্রাস, পানির দূষণ, বন-উজাড়, পশুখাদ্যের অভাব মাছের অভাব ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন।

১. কৃষি খাতের প্রাকৃতিক সম্পদ ভিত্তি প্রধানত-
ক. তিন প্রকার; খ. দুই প্রকার; গ. চার প্রকার।

২. বাংলাদেশের মোট জমির আয়তন-
ক. প্রায় ১৫ মি. হেক্টর; খ. প্রায় ২ মি. হেক্টর; গ. প্রায় ২২ মিঃ হেক্টর।

৩. বাংলাদেশের মোট জমির মধ্যে আবাদযোগ্য জমির আপেক্ষিক গুরুত্ব হচ্ছে-
ক. ৫০ শতাংশ; খ. ৬০ শতাংশ; গ. ৬৫ শতাংশ

৪. বাংলাদেশের আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ বর্তমানে ক্রমশঃ
ক. বৃদ্ধি পাচ্ছে; খ. স্থির রয়েছে; গ. কমছে বৈ বাড়ছে না।

৫. একটি জমি তিন বার চাষ করা হলে এর চাষ তীব্রতার পরিমাণ হবে-
ক. ১.৭২; খ. ১.৫০; গ. ২.০০; ঘ. ৩.০০

৬. বাংলাদেশের জলসম্পদের প্রধান দুই উৎস হচ্ছে-
ক. হিমালয় ও বঙ্গোপসাগর; খ. খাল-বিল এবং নদী-নালা;
গ. ভূউপরিস্থ এবং ভূ-গর্ভরস্থ; ঘ. বৃষ্টি এবং নদীর পানি।

৭. বাংলাদেশে শুষ্ক মৌসুমের তুলনায় বর্ষা মৌসুমে পানির প্রাপ্যতা প্রায়-
ক. ১০ গুণ বৃদ্ধি পায়; খ. ১৩.৫ গুণ বৃদ্ধি পায়; গ. ১৪.৫ গুণ বৃদ্ধি পায়।

৮. বাংলাদেশর ভূগর্ভস্থ পানির গভীরতা-
ক. ৩ থেকে ৬ ফুট; খ. ৩ থেকে ৬ মিটার; গ. ৬ থেকে ১২ মিটার।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. কৃষির প্রাকৃতিক সম্পদ ভিত্তিগুলো কি?
২. ভবিষ্যতে বাংলাদেশের ভূ-সম্পদ কি বৃদ্ধি পাবে?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপের মুখে কৃষি সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত বিরূপ প্রতিক্রিয়াগুলোর ব্যাখ্যা করুন।
২. "পানি বাংলাদেশের আশির্বাদ, পানিই আবার বাংলাদেশের সর্বনাশ"-ব্যাখ্যা করুন।
৩. বাংলাদেশের যে ভূসম্পদ ও পানি সম্পদ রয়েছে তা ঠিক বাংলাদেশের কৃষির বিকাশের জন্য পর্যাপ্ত? উত্তরের পক্ষে আপনার যুক্তি দেখান।

৩.৩ ঃ উৎপাদন সংগঠন

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদনকারী নিম্নতম এককটি (Unit) কি;
- বাংলাদেশের উৎপাদন সংগঠনের চরিত্র অনুসারে কত ধরনের কৃষি খামার রয়েছে;
- "কৃষি খামারের" বিন্যাস সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে;
- বাংলাদেশে বর্গা-স্বত্ত্ব অনুসারে কত ধরনের খামার রয়েছে এবং তাদের বিন্যাস সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে; এবং
- বাংলাদেশে ভূমিহীন কারা এবং তাদের সংখ্যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।

এই পাঠ শেষে আপনি আরও উপলব্ধি করতে পারবেন, কেন বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন পদ্ধতিকে উন্নত দেশগুলোর অনুরূপ **'সমাজতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী'** কৃষি উৎপাদন হিসেবে অভিহিত করা ঠিক হবে না।

উৎপাদন সংগঠনের একক

কৃষি উৎপাদন নানা ধরনের সংগঠনের আওতায় সংগঠিত হতে পারে। পুঁজিবাদী সংগঠনের আওতায় যখন কৃষি উৎপাদন সংগঠিত হয় তখন তা ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে কৃষি মজুর খাটিয়ে সম্পন্ন করা হয়। সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের আওতায় রাষ্ট্রীয় বা সমবায় মালিকানাধীন জমিতে খামার সদস্যরা যৌথভাবে কৃষি উৎপাদন সম্পন্ন করে থাকেন। কখনো কখনো আবার ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি বর্গা নিয়ে বা ভাড়া নিয়ে বর্গাচাষী বা চুক্তিবদ্ধ চাষী কৃষি উৎপাদন সংগঠিত করে থাকেন। কিন্তু এসব যাবতীয় বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন সংগঠন অবিমিশ্র (Pure) বা মিশ্র (Mixed) উভয় রূপেই একটি দেশে বিরাজ করতে পারে। বাংলাদেশে বর্গা-উৎপাদন, ব্যক্তিমালিকানাধীন নিজস্ব পারিবারিক খামার, পুঁজিবাদী খামার, সমবায় খামার ইত্যাদি সব ধরনের কৃষি উৎপাদন সংগঠনের সম্মিলিত মিশ্র উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন সংগঠনটি হচ্ছে "ব্যক্তি মালিকানাধীন পারিবারিক খামার" সংগঠন। উৎপাদন সংগঠন বা খামারের চরিত্র যাই হোক না কেন, উৎপাদন সংগঠক হিসেবে আমরা যে নিম্নতম একককে চিহ্নিত করতে পারি তা হচ্ছে "পরিবার"। গ্রামাঞ্চলে এই "পরিবারের" সঠিক সংজ্ঞা হচ্ছে "এমন কতকগুলো লোকের সমষ্টি যারা একই রান্না খেয়ে থাকেন বা যাদের খাদ্য একই হাড়িতে রান্না হয়।" এই জন্য গ্রামে উৎপাদন সংগঠনের নিম্নতম একককে অনেক সময় "খানা" বা "চুলা" নামে অভিহিত করা হয়।

গ্রামাঞ্চলে "পরিবারের" সঠিক সংজ্ঞা হচ্ছে "এমন কতকগুলো লোকের সমষ্টি যারা একই রান্না খেয়ে থাকেন বা যাদের খাদ্য একই হাড়িতে রান্না হয়।" গ্রামে উৎপাদন সংগঠনের নিম্নতম একককে অনেক সময় "খানা" বা "চুলা" নামে অভিহিত করা হয়।

খামার

কৃষি উৎপাদন সর্বদাই জমিতে হয়। একই খানা/চুলা/পরিবারের অধীনে বা নিয়ন্ত্রণে যতগুলো কৃষি জমি রয়েছে তার সম্মিলিত নাম হচ্ছে খামার। এখানে কৃষি জমি বলতে আমরা সর্বপ্রকার কৃষি উৎপাদনে ব্যবহৃত সর্বপ্রকার "কৃষি-জমির" মোট পরিমাণকে বোঝাচ্ছি। একটি খামারের আয়তন কতটুকু তা পরিমাপের জন্য আমাদের প্রথমে খামারের নিয়ন্ত্রণে দু'ধরনের জমির পরিমাণই জানতে

হবে। একটি খামার মালিকানায় যতটুকু জমি রয়েছে তাকে খামারের মালিকানাধীন জমি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। একটি খামারের অধীনে যে সব জমিতে কৃষি উৎপাদন হচ্ছে সেগুলোকে একত্রে খামারের চাষাধীন জমি (Operational land) বলা হয়। একটি খামার বা খামারের অধীনে চাষাধীন

জমি এবং মালিকানাধীন জমি সর্বদা এক সমান নাও হতে পারে।

খামারের আয়তন বলতে সাধারণত: খামার বা খানার অধীনস্ত চাষাধীন জমিই বুঝে থাকি।

খামারের অধীনে চাষাধীন জমি= খামারের মালিকানাধীন জমি- যে জমি অন্যকে বর্গা বা ভাড়া দেওয়া হয়েছে + যে জমি অন্যের কাছ থেকে বর্গা বা ভাড়া নেয়া হয়েছে।

বস্তুত: খামারের আয়তন বলতে সাধারণত: খামার বা খানার অধীনস্ত চাষাধীন জমিই (Operational land) বুঝে থাকি। খামারের অধীনের জমিগুলো সর্বসময় একত্রে নাও থাকতে পারে। খন্ডীকরণের (Fragmentation) ফলে একটি খামারের মোট জমি অনেকগুলো প্লটে বিভক্ত হতে পারে।

ভূমিস্বত্ত্ব ও খামারের গড় আয়তন

ভুমির উপর খানার/পরিবারের নিয়ন্ত্রণের মাত্রা ও চরিত্রকে বলা হয় ভূমিস্বত্ত্ব। খামারের আয়তনের সঙ্গে ভুমিস্বত্ত্বের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। যদিও এই সম্পর্কের গাণিতিক অনিবার্যতা শতকরা একশত ভাগ নয়, তবুও সাধারণতভাবে বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন সংগঠনের চরিত্র বিশ্লেষকরা এই ধরনের একটি সাধারণ (খামারের আয়তন বলতে সাধারণত: খামার বা খানার অধীনস্ত চাষাধীন জমিই (general) এবং আদর্শ (খামারের আয়তন বলতে সাধারণত: খামার বা খানার অধীনস্ত চাষাধীন জমিই (typical) সম্পর্ক সত্য ধরে নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন। বাংলাদেশের কৃষি খাতের মিশ্র খাতের মিশ্র উৎপাদন সংগঠনের চরিত্রায়নের জন্য এ ধরনের সংজ্ঞার ব্যবহারিক মূল্য যথেষ্ট। নিচে বহুল প্রচলিত স্ট্যান্ডার্ড সম্পর্ক ও সংজ্ঞাগুলোর বর্ণনা করা হলো:

ক. ক্ষুদ্র চাষী বা ক্ষুদ্র খামার বা আত্মপোষণাকারী খামার

সাধারণত: এসব খামারে গড় আয়তন ২.৫ একর বা ১ হেক্টরের কম। যেহেতু গড়ে খামারের সদস্য আয়তন বাংলাদেশে ৫ থেকে ৬ জন এবং বাংলাদেশের গড় চাষ তীব্রতা ২ (দুই) এর চেয়ে কম, সুতরাং স্বভাবত:ই এই স্বল্প জমির কৃষি উৎপাদন দ্বারা পরিবারের/খানার সকল সদস্যদের মৌলিক প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হয় না। এ ধরনের খামারের আয় দ্বারা খামার সদস্যদের ভরণপোষণ খরচ (Subsistence Expenditure) মেটানো সম্ভব নয়। ঘাটতি পূরণ করে বেঁচে থাকার জন্য এ ধরনের খামারের সক্ষম সদস্যরা সচরাচর কৃষি বহির্ভূত অন্যান্য অকৃষিভিত্তিক কাজে নিয়োজিত থাকেন। কেউ কেউ কৃষি বা অকৃষি খাতে নিজের খামারের বাইরে শ্রমশক্তি বিক্রি করে থাকেন। অবশ্য এসব খামার বহির্ভুত কাজে সাধারণত: এরা অংশ নেন হালকা মৌসুমে যখন তাদের নিজস্ব খামারে কৃষি উৎপাদনের কাজ থাকে না বা কাজের পরিমাণ কমে আসে। বাংলাদেশের কৃষি খাতে এ ধরনের খামারের সংখ্যাই সর্বাধিক এবং এরাই গ্রামীন চাষী পরিবারদের মধ্যে প্রধান স্থান দখল করে রয়েছেন। এদের এই প্রাধান্য দীর্ঘমেয়াদীও বটে অর্থাৎ এরা গুরুত্ব নিয়েই টিকে আছেন দিনের পর দিন। ১৯৬২ সালে প্রাক- স্বাধীনতা আমলে এ ধরনের আত্মপোষণশীল ক্ষুদ্র খামারের সংখ্যাগত গুরুত্ব ছিল সকল প্রকার খামারের ৫২ শতাংশ। কিন্তু তাদের নিয়ন্ত্রণ তখন চাষাধীন জমি (Operational) ছিল মাত্র ১৬ শতাংশ। বিশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর ১৯৮৩-৮৪ সালের কৃষি শুমারির পর (Agricultural) তা আরো বেড়ে ৭০ শতাংশ। অথচ তাদের নিয়ন্ত্রণে চাষাধীন জমির

বাংলাদেশে ক্ষুদে চাষীরা সংখ্যায় বাড়ছে এবং তাদের অধীনে খামারের গড় আয়তন ক্রমশ: কমছে।

পরিমাণ তুলনামূলকভাবে ততটা বৃদ্ধি পায়নি। ১৯৮৩-৮৪ সালে তাদের নিয়ন্ত্রণে চাষাধীন জমি ছিল মোট জমির মাত্র ২৯ শতাংশ। এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় যে, বাংলাদেশে ক্ষুদে চাষীরা সংখ্যায় বাড়ছে এবং তাদের অধীনে খামারের গড় আয়তন ক্রমশ: কমছে। ১৯৬২ তে ক্ষুদ্র চাষীদের খামারের গড় আয়তন ছিল ১.১১ একর (বা .৪৪ হেক্টর) আর ১৯৮৩-৮ তে তা হয়েছিল .৯৩ একর (বা.৩৭ হেক্টর)। ১৯৯৬ সালের সর্বশেষ কৃষিশুমারী অনুসারে খুদে খামারের আপেক্ষিক গুরুত্ব হয়েছে প্রায় ৮০ শতাংশ। তাদের অধীন জমির পরিমাণ মাত্র ৪১ শতাংশ। গত খামার আয়তন ০.৮৭ একর। একাডেমিক মহলে একটি বহমান বিতর্ক রয়েছে এই ক্ষুদে চাষীদের ক্রমাবনতি নিয়ে। কেউ কেউ মনে করেন ক্ষুদে চাষীদের অভাবের কারণে তারা শেষ পর্যন্ত জমি বিক্রি করে শ্রম বাজারে প্রবেশ করতে বাধ্য হবেন এবং তার ফলে গ্রামাঞ্চলে দুই বিপরীত মেরুর সৃষ্টি হবে-একদিকে থাকবেন বৃহৎ পুঁজিপতি খামার মালিক ও অন্যদিকে ভুমিহীন ক্ষেতমজুর। পক্ষান্তরে আরেক দল মনে করেন যে বাংলাদেশের ক্ষুদে চাষীদের মধ্যে "দারিদ্রায়ন" (Pauperization) ঘটলেও, কোন মেরুকরণ তার দ্বারা সংগঠিত হবে না। এদের ধারণা হচ্ছে যেহেতু বাংলাদেশে কাজের সুযোগ খুব কম, পুঁজিবাদী বৃহৎ খামারের সংখ্যাও কম এবং অকৃষি খাতের শ্রম চাহিদাও যথেষ্ট নয়, সেহেতু বাংলাদেশের ক্ষুদে চাষীরা নিজের জমিটাকে আঁকড়ে ধরেই বেঁচে থাকতে বেশি নিরাপদ বোধ করেন। এই কারণে অভাবে পড়লেও সহজে তারা জমি বিক্রি করেছেন না। যেটা বাস্তবে আমরা দেখছি তা মূলত: একই দরিদ্র পরিবারের আয়তন বৃদ্ধি এবং অবশেষে তাদের মধ্যে ক্ষুদ্রে খন্ডীকরণ হয়ে বিভক্ত হয়ে যাওয়া। এটাকে মেরুকরণ না বলে (Demographic Differentiation) বিভাজন নামে অভিহিত করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, বাংলাদেশে ক্ষুদে খামার মালিকদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। ক্রমবর্ধমান পারিবারিক চাহিদার চাপ এবং অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল খামার মালিকদের সঙ্গে উপাদানের উপদান (Factors of production) এবং উপাদন বাজারে বর্ধিত প্রতিযোগিতার মুখে এদের পক্ষে টিকে থাকা ক্রমাগদতই কঠিন হয়ে পড়বে। তাই খামার বহির্ভুত কাজ, স্বল্পভোগ ও বেশি খাটুনিকে ভিত্তি করেই এদের দিন গুজরান হচ্ছে। যদিও সম্প্রতি গ্রামাঞ্চলে এন.জি.ও কার্যক্রমের ফলে এদের সুযোগ সুবিধা কিন্তু পরিমাণে বেড়েছে। কিন্তু বেশিরভাগ এন.জি.ও কার্যক্রমের টার্গেট গ্রুপের আওতায় এই ক্ষুদ্র চাষীরা পড়েন না একথাও সত্য বটে। তবে অন্যদিকে হয়তো মাঝারি চাষীদের মধ্যে থেকে ছিটকে এসে অনেক পরিবারই ক্ষুদে চাষীদর খাতায় নাম লেখাচ্ছেন। সম্ভবত: এ কারণেই তাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব (সংখ্যাগত) ১৯৬০-১৯৮৩/৮৪ কালপর্বে ৫২ শতাংশ থেকে বেড়ে ৮০ শতাংশ পরিণত হয়েছে। বর্তমানেও সম্ভবত: এই প্রবণতা অক্ষুন্ন রয়েছে।

বাংলাদেশে ক্ষুদে খামার মালিকদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। ক্রমবর্ধমান পারিবারিক চাহিদার চাপ এবং অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল খামার মালিকদের সঙ্গে উপাদানের উপদান এবং উপাদন বাজারে বর্ধিত প্রতিযোগিতার মুখে এদের পক্ষে টিকে থাকা ক্রমাগদতই কঠিন হয়ে পড়বে।

খামারের ধরণ	মোট খামার সংখ্যার শতাংশ		মোট আবাদী জমির শতাংশ	
(জমির পরিমাণ)	১৯৬০	১৯৮৩-৮৪	১৯৬০	১৯৮৩-৮৪
ক্ষুদ্র খামার (২.৫ একর পর্যন্ত)	৫২	৭০	১৬	২৯
মাঝারি খামার (২.৫ একর থেকে ৭.৫ একর পর্যন্ত)	৩৮	২৪.৭	৪৬	৪৫
বাড় খামার (৭.৫ একরের বেশি)	১০	৪.৯	৩২.৪	২৫.৯

উৎস: ১৯৬০ ও ১৯৮৩-৮৪ সালের কৃষি শুমারি।

মাঝারি চাষী বা মধ্যম খামার বা স্বয়ংসম্পূর্ণ খানা

সাধারণভাবে মাঝারি চাষী গোষ্ঠীটির আয় নিজেদের চলার জন্য পর্যাপ্ত বিধায় তারা বাইরে শ্রম বাজারে বা অকৃষি খাতের কাজে নিযুক্ত থাকেন না।

এই ধরনের খামারের গড় আয়তন ধরা হয় ২.৫ একর থেকে ৭.৫ একর পর্যন্ত। কোন কোন কৃষিবিদ আবার এদের মধ্যে দুটি উপবিভাগের পক্ষপাতি। যাদের জমি ৭.৫ এককের কাছাকাছি তাদেরকে তারা উচ্চ মধ্যবিত্ত চাষী এবং যাদের খামার ২.৫ এককের কাছাকাছি তাদেরকে নিম্ন মধ্যবিত্ত চাষী হিসেবে অভিহিত করার প্রস্তাবটি কিছু পরিমাণে যৌক্তিক। এই প্রস্তাবের তাত্ত্বিক ভিত্তি হচ্ছে এই যে, নিম্নমধ্যবিত্ত চাষীরা যদিও অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ কিন্তু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও বাইরের তীব্র প্রতিযোগিতার কারণে তার ক্রমশ: নিম্নগামী ও অবশেষে ক্ষুদ্র চাষীদের খাতায় নাম লেখাতে বাধ্য হচ্ছেন বা হবেন। পক্ষান্তরে এদের মধ্যে যারা উচ্চ মধ্যবিত্ত চাষী তাদের পক্ষে কিছু উদ্বৃত্ত সঞ্চয় করে স্বীয় মেধা, শ্রম বা বাড়তি কোন অপ্রত্যাশিত সুযোগের সাহায্যে ধনী গৃহস্থে পরিণত হওয়া সম্ভব।

সাধারণভাবে মাঝারি চাষী গোষ্ঠীটির আয় নিজেদের চলার জন্য পর্যাপ্ত বিধায় তারা বাইরে শ্রম বাজারে বা অকৃষি খাতের কাজে নিযুক্ত থাকেন না। ফলে তাদের পরিপূর্ণ মনোযোগ থাকে কৃষি কাজের প্রতি। তদুপরি তারা শুধু শ্রম দিয়েই চাষ কার্য পরিচালনা করেন না তাদের যেটুকু পুঁজি ও শিক্ষা রয়েছে সেটিও পরিপূর্ণভাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নিয়োগ করে থাকেন। ফলে সাধারণভাবে এদের খামারের উৎপাদনশীলতা বা ফলন ক্ষুদ্র চাষী বা ধনী চাষী উভয়ের তুলনায় উচ্চতর হয়।

প্রাক-স্বাধীনতা আমলে, ১৯৬০ সালের কৃষি শুমারি মাঝারি খামারের সংখ্যাগত আপেক্ষিক গুরুত্ব ছিল ৩৮ শতাংশ। আর তাদের অধীনে আবাদী জমির পরিমাণ ছিল ৪৬ শতাংশ। ১৯৮৩-৮৪ তে এসে দেখা যায় যে, এদের সংখ্যাগত গুরুত্ব কমে হয়েছে ২৫ শতাংশ যদিও এদের হাতে জমির পরিমাণ রয়ে গেছে ৪৫.১ শতাংশ। ১৯৯৬ সালে এসে এদের আপেক্ষিক গুরুত্ব আরো কমে হয়েছে মাত্র ১৮ শতাংশ। যদিও এদের হাতে জমির আপেক্ষিক গুরুত্ব হয়েছে ৪২ শতাংশ। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মাঝারি কৃষকের তলের দিকে ধসের পরিমান উপরের দিকে উর্ধ্বগমনের পরিমানের চেয়ে বেশি হয়েছে। অথবা কারো কারো অনুমান হচ্ছে যে, বাংলাদেশের সকল কৃষি খামারেই দারিদ্রায়ন ঘটছে অর্থাৎ ধনী চাষী মাঝারি চাষীতে পরিণত হচ্ছে এবং মাঝারি চাষী ক্ষুদ্র চাষীতে পরিণত হচ্ছে এবং ক্ষুদ্র চাষী ভূমিহীনে পরিণত হচ্ছে। শুধু কালানুক্রমিক খামার বিন্যাস এবং খামারের অধীনে জমির বন্টর থেকে এসব পরস্পর বিরোধী ব্যাখ্যার সঠিক কোন মিমাংসা সম্ভব নয়। তবে এটুকু নিশ্চিত বলা যায় যে, বাংলাদেশে "মেরুকরণ হয়ে বৃহদায়তন পুঁজিবাদী খামারের এবং ভূমিহীন কৃষি মজুরের" এ কথা বলা সঠিক হবে না। তবে কৃষিতে নিশ্চিত ভাবে বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশে "মেরুকরণ হয়ে বৃহদায়তন পুঁজিবাদী খামারের এবং ভূমিহীন কৃষি মজুরের" এ কথা বলা সঠিক হবে না। তবে কৃষিতে নিশ্চিত ভাবে বৈষম্য বৃদ্ধি

কৃষির উপর এককভাবে ভিত্তি করে বর্তমানে গ্রামীন ক্ষমতা কাঠামোয় আপন অবস্থান টিকিয়ে রাখা মুশকিল হয়ে পড়ায় এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমানরা ক্রমাগত অকৃষি খাতের দিকে ঝুঁকছেন। ভাবে বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ধনী চাষী বা উদ্বৃত্ত খামার

যে সমস্ত খামারের ৭.৫ একরের উপর তাদেরকে উদ্বৃত খামার এবং তাদের মালিক খানা/পরিবারকে ধনী চাষী বলা হয়। এরা সাধারণত: নিজেরা কৃষি কাজে শ্রম নিয়োগ করেন না। মূলত: রাখাল ও মৌসুমী ক্ষেতমজুরদের দ্বারা নিজেদের তত্ত্বাবধানে এরা কৃষি উৎপাদন করেন। এজন্য এদের অনেক সময় মালিক ব্যবস্থাপক (Owner Manager) কৃষক হিসেবে অভিহিত করা হয়।

তবে মাঝারি চাষীর মত এরা শুধু কৃষির প্রতিই এককভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ রাখেন না। প্রায়ই এদের একটি দুটি ছুটকা-ছাটকা অকৃষি ভিত্তিক ব্যবসা থাকে যেমন: সারের ডিলারশীপ, চাল কলের মালিক, হাটে-বাজারে দোকান, গুদাম ইত্যাদি।

এরাই বর্তমানে গ্রামের সালিশ, নির্বাচন, সামাজিক ক্রিয়াকান্ডে প্রভুত্ব বিস্তার করে আছেন। তবে কারো কারো মতে কৃষির উপর এককভাবে ভিত্তি করে বর্তমানে গ্রামীন ক্ষমতা কাঠামোয় আপন

অবস্থান টিকিয়ে রাখা মুশকিল হয়ে পড়ায় এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমানরা ক্রমাগত অকৃষি খাতের দিকে ঝুঁকছেন।

এদের আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রাক-স্বাধীনতা আমলে ১৯৬০ এর কৃষি শুমারি অনুযায়ী ছিল মোট খামার সংখ্যার মাত্র ১০ শতাংশ। কিন্তু তখন তাদের খামারের অধীনে জমির পরিমাণ ছিল মোট আবাদী জমির ৩৮ শতাংশ। ১৯৮৩-৮৪ সালে এতে দেখা যায় যে, এদের আপেক্ষিক গুরুত্ব বিপুলভাবে কমে সকল খামারের মাত্র ৪.৯ শতাংশ এবং তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন জমির পরিমাণ হয়েছে মোট আবাদী জমির ২৬ শতাংশ। বর্তমানে (১৯৯৬) এদের আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৫২ শতাংশ এবং জমির নিয়ন্ত্রণ প্রায় ১৭ শতাংশ।

বাংলাদেশের বর্গা/চুক্তি ব্যবস্থা

জমি বর্গা বা চুক্তির অধীনে ভাড়া নিচ্ছে বা নিচ্ছে না এর উপর ভিত্তি করে খামারগুলোকে আবার প্রধান ৩টি ভাগে বিভক্ত করা সম্ভব। এদের চরিত্র এবং এদের কালানুক্রমিক গুরুত্বের বিবর্তন নিয়ে নিচে আলোচনা করা হলো-

মালিক চাষী

যে খামারের সমস্ত জমিই খামার মালিকের মালিকানাধীন তাদেরকে মালিক চাষী বলা হয়। ১৯৬০ সালে এ ধরনের মালিক চাষীদের খামারের গড় আয়তন ছিল ৩.১২ একর। ১৯৮৩-৮৪ তে তা কমে দাঁড়ায় ২.১৩ একর। ১৯৯৬ সালে তা হয়েছে ১.৬০ একর।

মালিক ও বর্গা চাষী

এ ধরনের খামারের অন্তত: কিছু অংশ জমি অন্য মালিকের কাছ থেকে বর্গা/চুক্তির মাধ্যমে বন্দোবস্ত নেয়া হয়েছে। এদের খামারের গড় আয়তন ছিল ১৯৬০ সনে ৪.১৬ একর। ১৯৮৩-৮৪ সালে এদের খামারের গড় আয়তন দাঁড়ায় ২.৫৮ একর।

তালিকা ৩.৬ ঃ বাংলাদেশে বর্গা-স্বত্ত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার খামারের গড় আয়তনের গতি প্রবণতা

খামারের ধরন	খামারের গড় আয়তন (একর)		
	১৯৬০	১৯৭৮	১৯৮৩-৮৪
মালিক চাষীর খামার	৩.১২	২.৩৬	২.১৩
মালিক ও বর্গা/চুক্তিবদ্ধ চাষীর খামার	৪.২৬	৩.৫৩	২.৫৮
ভূমিহীন বর্গা/চুক্তিবদ্ধ চাষীর খামার	৪.২৬	৩.৫৩	০.১৯
সকল প্রকার খামার	৩.৫৪	২.৬২	২.২৭

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, স্ট্যাটস্টিক্যাল ইয়ার বুক, বিভিন্ন বাৎসরিক সংখ্যা।

ভূমিহীন বর্গা চাষী

এ ধরনের খামারের সমস্ত জমিই অন্য মালিকের কাছ থেকে বর্গা/চুক্তির মাধ্যমে বন্দোবস্ত নেয়া হয়েছে। ১৯৬০ সালে এদের খামারের গড় আয়তন ছিল ২.৪২ একর। ১৯৮৩-৮৪তে এসে তা হয়েছিল ২.২৭ একর।

বর্গার প্রচলিত নিয়মটি হচ্ছে বর্গা-গ্রহীতা সমস্ত শ্রম ও উৎপাদন খরচ বহন করে ফসল উৎপাদন করবে। এরপর উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক বর্গা মালিক পাবেন। বাকী অর্ধেক বর্গাচাষী পাবেন।

সাধারণত: বাংলাদেশে বৃহৎ ভূস্বামীরা তাদের মালিকানাধীন জমির অং বিশেষ ক্ষুদে মালিক চাষী বা ভূমিহীন পরিবারকে (যাদের লাঙ্গল ও উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি আছে) বর্গা বা চুক্তির মাধ্যমে বন্দোবস্ত দিয়ে থাকেন। বর্গার প্রচলিত নিয়মটি হচ্ছে বর্গা-গ্রহীতা সমস্ত শ্রম ও উৎপাদন খরচ বহন করে ফসল উৎপাদন করবে। এরপর উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক বর্গা মালিক পাবেন। বাকী অর্ধেক বর্গাচাষী পাবেন। অবশ্য উফশী এলাকায় যেহেতু ধান উৎপাদনের জন্য বীজ সার জলসেচ বাবদ খরচের

পরিমাণ বেড়ে যায় এবং অধিকাংশ গরীব বর্গা চাষীর পক্ষে ঐ ব্যয় বহন সম্ভব হয় না, সে জন্য উফশী জমির বর্গার শর্ত একটু আলাদা হয়। যদি চাষী গরীব ও ব্যয়ভার বহনে অক্ষম হয় তাহলে সেক্ষেত্রে বর্গা মালিক উৎপাদন উপকরণের (শ্রমছাড়া) খরচ বহন করেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে সাধারণত: ফসলের তৃতীয়াংশ তার প্রাপ্য হয়। কোথাও কোথাও অবশ্য বর্গার বদলে চুক্তির অধীনে উফশী জমি ভাড়া দেয়া হচ্ছে। সেক্ষেত্রে বর্গা-চাষী নিজেই উৎপাদন খরচ সম্পূর্ণটা বহণ করেন এবং ফসলের সমস্তটা নিজেই ভোগ করেন। খালি মৌসুমের শুরুতেই মালিককে একটি বাঁধা পরিমাণ অর্থ খাজনা হিসেবে দিতে হয় (Fixed Rent)।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বর্গার অধীনে জমির আপেক্ষিক গুরুত্ব হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু বর্গার উপর নির্ভরশীল কৃষি খামারের সংখ্যা কিন্তু মোটেও নগণ্য নয়।

বাংলাদেশে বর্গা জমি দরিদ্র ও ভুমিহীন চাষীদের অনেকাংশে টিকে থাকতে সাহায্য করছে। কিন্তু আবার অন্যদিকে এই ধরনের ব্যবস্থার কোন নিরাপত্তা নেই। যখন তখন বর্গাচাষীকে মালিক জমি থেকে উৎখাত করতে পারেন বলে এই অবস্থায় বর্গা চাষীরা সর্বদাই জমির মালিকের মুখাপেক্ষী থেকে যান। বিশেষত: যারা গরীব ভূমিহীন বর্গাচাষী তাদেরই নির্ভরশীলতার মাত্রা বেশি। এক হিসেবে জানা যায় যে, ১৯৮৩-৮৪ সালে বর্গা জমির পরিমাণ ছিল মোট আবাদী জমির ১৮.৭৭ শতাংশ। ১৯৭৮ সালের আরেকটি হিসাবে জানা যায় যে, এই পরিমাণটি ছিল ২২.৩৪ শতাংশ। সুতরাং অনুমান করা যায় যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বর্গার অধীনে জমির আপেক্ষিক গুরুত্ব হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু বর্গার উপর নির্ভরশীল কৃষি খামারের সংখ্যা কিন্তু মোটেও নগণ্য নয়। এমনকি ১৯৯৬ সালের সর্বশেষ কৃষি শুমারির প্রাথমিক প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে প্রায় ৫ কোটি ৫৬ লক্ষ ৩২ শতাংশ। আর যদি শুধু খামার পরিবারগুলোকে হিসাবে নেয়া হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, মালিক চাষী ও বর্গা চাষীর অনুপাত ১৯৮৩/৮৪ এবং ১৯৯৬ সাল এই উভয় বছরেই প্রায় ৬০ ঃ ৪০ ছিল বা আছে। তবে মালিক চাষীদের গড় খামার আয়তন ২.১৩ একর থেকে কমে হয়েছে ১.৬০ একর। পক্ষান্তরে বর্গা খামারের গড় আয়তন ২.৫৮ একর থেকে কমে হয়েছে ১.৮৮ একর।

জনসংখ্যার চাপে এবং সংকুচিত অকৃষিজ কর্মসুযোগের কারণে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীরা ক্রমাগত বিভাজিত হয়ে আরও ক্ষুদ্র এবং অবশেষে ভূমিহীনে পরিণত হচ্ছে।

বাংলাদেশে ভূমিহীনতা

আমরা আগের অধ্যায়ের আলোচনায় দেখিয়েছি জনসংখ্যার চাপে এবং সংকুচিত অকৃষিজ কর্মসুযোগের কারণে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীরা ক্রমাগত বিভাজিত হয়ে আরও ক্ষুদ্র এবং অবশেষে ভূমিহীনে পরিণত হচ্ছে। বাংলাদেশের গ্রামে এরাই হচ্ছেন সবচেয়ে নিপীড়িত সবচেয়ে বঞ্চিত ভূমিহীন বা প্রায় ভূমিহীন মজুর বা আধা-মজুর পরিবার। এদের এত জমি নেই যে, এরা শুধু জমির উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকবেন। আবার এত বাইরের কাজ/পুঁজি নেই যে, জমি পুরো ছেড়ে দিবেন। এই গোষ্ঠীকে আমরা যদি কার্যত: ভূমিহীন (Effectively Landess) হিসাবে ধরে নেই তাহলে এদের মধ্যে আমরা মোট তিন ধরনে ভূমিহীন পরিবারকে চিহ্নিত করতে পারি। ৩.৭ নং সারণীতে এই তিন ধরনের ভূমিহীনদের পরিমাণগত আপেক্ষিক গুরুত্বের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

সারণী ৩.৭ ঃ বাংলাদেশে ভূমিহীনতা

মালিকানাধীন ভূমির পরিমাণ (একরে)	গ্রামীণ পরিবারের শতাংশ	
	১৯৮৩/৮৪	১৯৯৫
০	৯	১০.৮
০-০.০৫	১৯	২২
০.০৬-০.৫০	২৮	২৮
মোট ভূমিহীন	৫৬	৬০.৮

উৎস: ১৯৮৩/৮৪-র কৃষি শুমারি এবং ১৯৯৬ সালের কৃষি শুমারির প্রাথমিক প্রকাশিত প্রতিবেদন।

খাঁটি ভূমিহীন পরিবার হচ্ছেন তারা যাদের বসতবাড়িও নেই, আবাদী জমিও নেই। এরকম আশ্রয়হীন-সম্বলহীন ভূমিহীনের আপেক্ষিক গুরুত্ব ছিল। ১৯৮৩-৮৪ সালে ৯ শতাংশ। যাদের বসতভিটার সমান অল্প জমি আছে (অর্থাৎ .০৫ একরের কম) তাদেরকে দ্বিতীয় স্তরের ভূমিহীন বলা যায়। এদের আপেক্ষিক গুরুত্ব ছিল ১৯৮৩-৮৪ সালে ১৯ শতাংশ। যাদের শুধু বসতভিটার সমান জমি নয়, আরো খুবই সামান্য আবাদী জমি আছে (অর্থাৎ বসতভিটা ও আবাদী জমি মিলিয়ে সর্বমোট .৫০ একরের কম) তাদেরকে তৃতীয় স্তরের ভূমিহীন হিসেবে অবিহিত করা চলে। ১৯৮৩-৮৪ সালে এদের আপেক্ষিক গুরুত্ব ছিল মোট গ্রামীণ পরিবারের ২৮ শতাংশ।

উপরোক্ত হিসাবানুসারে সব মিলিয়ে (প্রথম+দ্বিতীয়+তৃতীয় স্তর) বাংলাদেশে ভূমিহীন ও কার্যত: ভূমিহীন পরিবারগুলোই ছিল ১৯৮৩-৮৪ সালে গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিবার, মোট গ্রামীণ পরিবারের ৫৬ শতাংশ। এমনকি ১৯৯৫ সালের কৃষি শুমারির প্রাথমিক প্রতিবেদনে যেটুকু তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তাতেও দেখা যায় যে, এখন বাংলাদেশের গ্রামীণ পরিবারের শতকরা ষাট ভাগই হচ্ছেন কার্যত: ভূমিহীন।

সারসংক্ষেপ

কৃষি উৎপাদন সংগঠক নিম্নতম এককের নাম পরিবার/খানা। পরিবার বা খানা হচ্ছে এমন লোকদের সমষ্টি যারা একই চুলায় প্রস্তুতকৃত খাবার খেয়ে বেঁচে থাকেন। যদিও উৎপাদন সংগঠিত করে থাকে পরিবার বা খানা, কিন্তু উৎপাদন সংগঠিত হয় সামাজিকভাবে। উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন খানার মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে তার উপরই নির্ভর করে উৎপাদন সংগঠনের মৌল চরিত্র। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে যে উৎপাদন সংগঠনটি সর্বাধিক প্রচলিত তার নাম হচ্ছে "ব্যক্তি মালিকানাধীন পারিবারিক খামার। বাংলাদেশে বৃহদায়তন পুঁজিবাদী খামার বা যৌথ সমাজতান্ত্রিক খামারের অস্তিত্ব নগণ্য অথবা নেই। পারিবারিক খামারগুলোকে ভূমি স্বত্ব, শ্রম নিয়োগ, আয়-ব্যয় মাত্রা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যর ভিত্তিতে তিন ভাগে ভাগ করার সম্ভব যেমন- পারিবারিক ক্ষুদ্র খামার বা ঘাটতি খানা, মাঝারি আয়তনের খামার বা আত্মপোষণশীল খানা এবং বৃহদায়তন খামার বা উদ্বৃত্ত খানা। মাঝারি খামারকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা সম্ভব যেমন- নিম্নগামী এবং উর্ধ্বগামী। বাংলাদেশে বর্গা ও চুক্তি প্রথা বিদ্যমান। বর্গাই এখন পর্যন্ত প্রধান। যদিও উফশী এলাকায় চুক্তি প্রথার দ্রুত প্রসার ঘটছে। বর্গা চাষীরা সাধারণত: যথেষ্ট জমির মালিক হয় না, যদিও তাদের উদ্বৃত্ত হাল ও শ্রমশক্তি থাকে। বর্গা স্বত্ব অনুযায়ী খামারগুলোকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা সম্ভব যেমন- মালিক চাষীর খামার, যগপৎ মালিক ও বর্গা/চুক্তিবদ্ধ চাষীর খঅমার ভূমিহীন বর্গা/ চুক্তিবদ্ধ চাষীর খামার। বাংলাদেশের গ্রামের সমস্ত অধিবাসীর অর্ধেকের বেশি এখন পর্যন্ত কার্যন্ত: ভূমিহীন। এরাই বাংলাদেশের সবচেয়ে নিপীড়িত জনগোষ্ঠি। সামগ্রিক বিচারে বলা যায় যে, বাংলাদেশের দারিদ্রায়ন ও প্রান্তিকীকরণ অব্যাহত রয়েছে, যদিও মেরুকরণ ঘটে পুঁজিবাদী কৃষি খামারের আবির্ভাব হচ্ছে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন।

১. চুলা বা খানা বলতে বুঝায়-
   ক. খাবার পাত্র; খ. যেখানে রান্না করা হয়;
   গ. খাবার এবং রান্নার যন্ত্র; ঘ. লোকসমষ্টি যারা একই চুলার রান্নার উপর নির্ভর করেন।

২. ক্ষুদে খামারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-
   ক. এদের আয়তন ২.৫ একরের কম;
   খ. এরা ঘাটতি খানা;
   গ. এরা বাইরের মজুর সচরাচর নিয়োগ করেন না;
   ঘ. ক, খ গ তিনটিই সত্য।

৩. মাঝারি খামার এর মধ্যে যারা উর্ধ্বগামী তাদের আয়তন-
   ক. ৭.৫ এককের বেশি; খ. ৭.৫ এককের কম;
   গ. ৭.৫ একরের সমান; ঘ. ৭.৫ এককের কাছাকাছি বা সমান।

৪. বাংলাদেশে জমি ভাড়া নেয়ার প্রধান পদ্ধতি হচ্ছে-
   ক. বর্গা খ. চুক্তি; গ. খাই-খালাসী।

৫. বর্তমানে উফশী অঞ্চলে চুক্তি-বর্গার সংখ্যা-
   ক. বাড়ছে; খ. কমছে; গ. একই রকম আছে।

৬. বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে যারা কার্যতঃ ভূমিহীন তাদের মালিকানায়-
   ক. বসতভিটা আছে কিন্তু আবাদী জমি নেই;
   খ. বসতভিটা ও আবাদী জমি কোনটাই নেই;
   গ. বসতভিটা ও আবাদী জমি মিলিয়ে .৫০ একরের কম জমি আছে।

৭. বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে যারা কার্যতঃ ভূমিহীন তাদের মালিকানায়-
   ক. তিন ভাগের এক ভাগ; খ. দুই ভাগের এক ভাগ;
   গ. তিন ভাগের দুই ভাগ; ঘ. দশ ভাগের ছয় ভাগ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. বাংলাদেশে "ভূমিহীনের" সংজ্ঞা কি এবং সর্বশেষ আদমশুমারী অনুযায়ী তাদের পরিমাণ কত?

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন-সংগঠনের চরিত্রকে পুঁজিবাদী বালা যাবে কি? আপনার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দিন।

২. "বাংলাদেশের গ্রামে দারিদ্রায়ন হচ্ছে কিন্তু মেরুকরণ হচ্ছে না"-ব্যাখ্যা করুন।

৩. বাংলাদেশে বর্গা বা চুক্তিতে কারা কেন কাদেরকে জমি দিচ্ছেন এবং কারা কেন জমি বর্গায়/চুক্তিতে জমি নিচ্ছেন?

পাঠ ৩.৪ ঃ কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধির চালিকা শক্তি

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- বাংলাদেশের কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি কেন প্রধানত: ফসল উপখাতের প্রবৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল;
- ফসল উপখাতের প্রবৃদ্ধি কেন মূলত: দানাদার শস্যের প্রবৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল;
- বাংলাদেশে স্বাধীনতার আগে ও পরে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রধান চালিকাশক্তিগুলো;
- ২০১০ সালের দিকে বাংলাদেশের কৃষি খাতের যে সব সম্ভাব্য সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে যেমন ঃ নিম্ন হারের প্রবৃদ্ধি খাদ্য ঘাটতি, খোরাকী মুখীন ও অ-বিচিত্র কৃষি খাত ইত্যাদি বিষয়গুলো বর্ণনা;
- এবং এসব সমস্যা নিরসনের জন্য করণীয় কর্তব্যসমূহ।

কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধির প্রধান উপাদান ঃ ফসল খাতের প্রবৃদ্ধি

আমরা এই ইউনিটের প্রথম পাঠে উল্লেখ করেছি যে, বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন ৪টি উপখাতের উৎপাদনের সমবায়ে গঠিত। কিন্তু এদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে ফসল উপখাতের উৎপাদন। মোট কৃষি উৎপাদনের দুই-তৃতীয়াংশ এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশের ফসল উৎপাদন থেকেই আসে। আবার ফসল উৎপাদন উপখাতে প্রধানত: ৯টি বিশেষ ফসল অধিকাংশ জমি দখল করে আছে। বস্তুত: মোট আবাদী জমির প্রায় ৯৫ শতাংশ জমিতে বর্তমানে ধান, গম, পাট, আখ, আলু, মরিচ, তামাক এবং বিভিন্ন ধরনের ডালবীজ ও তৈলবীজ উপৎপাদিত হয়। সুতরাং ফসল উৎপাদনে এই ৯টি ফসলই প্রধান ভূমিকা রাখে। তবে লক্ষ্যনীয় যে, এই ৯টি ফসলের মধ্যে আবার একমাত্র ধানই ৮০ শতাংশ জমিতে চাষ করা হয়। সুতরাং বাংলাদেশের কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি, ফসলের প্রবৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল আর ফসলের প্রবৃদ্ধি ধানের প্রবৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল, এরকম বললে খুব একটা ভুল বলা হবে না। যদিও এ ধরনের এক ফসল নির্ভর অর্থনীতি (Mono-Crop Economy) কাম্য নয়।

বাংলাদেশে কৃষি ধানমুখী। আর ধান যেহেতু এ দেশের মানুষের প্রধান খাদ্য সেহেতু কৃষি অর্থনীতির চরিত্রও "খোরাকীমুখী"

ফসল বিন্যাস (Cropping Pattern)

বাংলাদেশে চাষকৃত (Cultivated) জমির কত অংশ কোন ফসলের জন্য বরাদ্দ হয় তার একটি নমুনা গড় চিত্র (Typical profile) তুলে ধরা হয়েছে এ.আর.খান ও মাহাবুব হোসেনের পুস্তকে। বইটিতে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত তথ্যাবলী ব্যবহার করা হয়েছে বিধায় এই চিত্র বর্তমানে কিছুটা পুরনো হয়ে গেছে এবং সমকালীন অবস্থার সঙ্গে এর হুবহু মিল নাও থাকতে পারে। তবুও মনে হয় মোটামুটি অবস্থা (Pattern) একই রকম রয়ে গেছে। উক্ত বর্ণনানুসারে বাংলাদেশের চাষকৃত জমির ৮০ শতাংশে ধান বপিত হয়, ৫ শতাংশ জমিতে পাটের চাষ হয় , ৫ শতাংশের কিছু কম জমিতে গমের আবাদ হয় এবং বাকী অন্যান্য ফসলগুলো আবাদ হয় অবশিষ্ট মাত্র ৫ শতাংশ জমিতে। সুতরাং স্পষ্টত:ই প্রতীয়মান যে, বাংলাদেশে কৃষি ধানমুখী। আর ধান যেহেতু এ দেশের মানুষের প্রধান খাদ্য সেহেতু কৃষি অর্থনীতির চরিত্রও "খোরাকীমুখী" (Subsistence Oriented)।

প্রাক-স্বাধীনতা আমলে ফসল খাতের প্রবৃদ্ধি, বিশেষত: দানাদার শস্যের প্রবৃদ্ধি মূলত: নির্ভরশীল ছিল দানাদার শস্যের উৎপাদনশীরতা বা ফলন বৃদ্ধির উপর।

ফসল খাতে প্রবৃদ্ধির প্রবণতা ঃ

ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে পারে প্রধানত: দুইভাবে। প্রথমত: জমির পরিমাণ বাড়ালে বা আবাদ বাড়ালে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে (যদি উৎপাদন নেতিবাচক না হয়)। দ্বিতীয়ত: জমি না বাড়িয়েও শুধুমাত্র ফলন বা জমির উৎপাদনশীলতা বাড়িয়েও ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। সাধারণত:

এই দুটি চালিকা শক্তির যুগপৎ ক্রিয়ার ফলেই ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। যদি প্রধানত: ধানের জমি বৃদ্ধি করেই ধান উৎপাদন বাড়ানো হয়ে থাকে, তাহলে তাকে আমরা 'প্রসারের দ্বারা প্রবৃদ্ধি' (Extensive growth) বলে থাকি। যেসব দেশে প্রচুর আবাদী জমি চাষ ছাড়া পড়ে আছে সেখানে "প্রসারের দ্বারা প্রবৃদ্ধির" প্রবণতাই বেশি দেখা যায়। কিন্তু যেসব দেশে বাড়তি জমি আর নেই, সেসব দেশে জমির একক প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি করেই ফসলের পরিমাণ বাড়াতে হবে। এ ধরনের প্রবৃদ্ধিকে "ঘন প্রবৃদ্ধি" (Intensive growth) বলা যেতে পারে। বাংলাদেশে ফসল খাতের প্রবৃদ্ধির অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, স্বাধীনতার আগে বা পরে কখনোই "প্রসারের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির" (Extensive growth) প্রবণতার প্রাধন্য ছিল না। তবে যেটা আরো লক্ষ্যণীয়, তা হচ্ছে যত দিন যাচ্ছে ততই "প্রসারের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি'র সীমিত মাত্রাটি ক্রমাগত আরো সংকুচিত হচ্ছে এবং "ঘন-প্রবৃদ্ধির" কৌশলই ক্রমাগত আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে প্রমাণ্য তথ্যাবলী ৩.৮ নং সারণীতে তুলে ধরা হয়েছে।

সারণী ৩.৮ ঃ ফসল খাতের প্রবৃদ্ধি ঃ প্রাক-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা পরবর্তীকালের অভিজ্ঞতা

নং	ফসলসমূহ	কালপর্ব	মোট ফসল উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার (১৯৮১-৮২) স্থির দামে উৎপাদনমূলক মাপা হয়েছে)	চাষকৃত জমির প্রবৃদ্ধির হার	জমির এককপ্রতি ফলন বা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির হার
১.	ধান+গম (দানাশস্য)	১৯৫০-৭১	২.৬	১.১	১.৫
		১৯৭৩-৮৬	২.৮	০.৯	১.৯
২.	অ-দানাদার শস্য	১৯৫০-৭১	২.২	১.৩	০.৯
		১৯৭৩-৮৬	০.৯	-০.১	১.০
৩.	প্রধান ফসলসমূহ	১৯৫০-৭১	২.৫	১.১	১.৪
		১৯৭৩-৮৬	২.৫	০.৮	১.৭

উৎস: ড. মাহাবুব হোসেন ও এ.আর খান. প্রাগুক্ত

বর্তমানে বাংলাদেশে ফসল খাতের প্রবৃদ্ধি প্রধানত: নির্ভর করছে ফলন বৃদ্ধির উপর। তবে খাদ্য-শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য স্বাধীনতার পর "জমির" পরিমাণ বৃদ্ধি এখনো ইতিবাচক অবদান রাখছে- একথা সত্য।

সারণীর প্রদত্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, প্রাক-স্বাধীনতাকালে (১৯৫০-৭১) দানাদার শস্যের (ধান ও গম) গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ২.৬ ভাগ। এই ২.৬ ভাগ প্রবৃদ্ধির মধ্যে ১.১ ভাগ প্রবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল "দানাদার শস্যের অধীনে আবাদকৃত জমির পরিমাণ প্রসারের ফলে" আর বাকি ১.৫ ভাগ প্রবৃদ্ধির পেছনে চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছিল ফলন/উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ১৯৫০-৭১ কালপর্বে দানাদার শস্যের প্রবৃদ্ধির পেছনে "প্রসারের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির" অবদান ছিল ৪২ শতাংশ আর "ঘন প্রবৃদ্ধির" অবদান ছিল ৪৮ শতাংশ। একই তালিকায় দেখা যাচ্ছে অদানাদার শস্যের ক্ষেত্রে ১৯৫০-৭১ কালপর্বে মোট প্রবৃদ্ধির হার ছিল অপেক্ষাকৃত কম অর্থাৎ শতকরা ২.২ ভাগ এবং এর পেছনে "প্রসারের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির" অবদান ছিল শতকরা ৫৯ ভাগ যে ফসলখাতের গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল প্রাক-স্বাধীনতা কালপর্বে শতকরা ২.৫ ভা, যার মধ্যে "প্রসারের দ্বারা প্রবৃদ্ধির"অবদান শতকরা ৪৪ ভাগ এবং "ঘন প্রবৃদ্ধির" অবদান শতকরা ৫৬ ভাগ। সুতরাং এ কথা সুস্পষ্ট যে প্রাক-স্বাধীনতা আমলে ফসল খাতের প্রবৃদ্ধি, বিশেষত: দানাদার শস্যের প্রবৃদ্ধি মূলত: নির্ভরশীল ছিল দানাদার শস্যের উৎপাদনশীলতা বা ফলন বৃদ্ধির উপর। আর যেহেতু ফসল খাতের বাকি ফসলগুলোর সম্মিলিত মূল্য একটা বেশি ছিল না সেহেতু ফসল খাতের সামগ্রিক প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকা শক্তির ভূমিকায় "ঘন প্রবৃদ্ধির" উপাদান গুলোকেই মূলত: সক্রিয় হতে হয়েছে।

স্বাধীনতা পরবর্তীতে (১৯৭৩-৮৬) সালে উপরোক্ত প্রবণতাই আরো তীব্র হয়েছে মাত্র। এ কালপর্বে সমগ্র ফসল খাতের প্রবৃদ্ধি হার প্রাক-স্বাধীনতা হারের সমান ছিল অর্থাৎ শতকরা ২.৫ ভাগ। কিন্তু এতে "প্রসারের দ্বার প্রবৃদ্ধির" অবদান ছিল মাত্র শতকরা ৩২ ভাগ, পক্ষান্তরে ঘনপ্রবৃদ্ধির অবদান ছিল শতকরা ৬৮ ভাগ। আরো লক্ষণীয় যে, দানাদার শস্যের প্রবৃদ্ধির হার স্বাধীনতা পরপর্তীকালে ২.৬ থেকে বেড়ে ২.৮ ভাগ এ পরিণত হয়। কিন্তু এ বর্ধিত প্রবৃদ্ধির পুরোটাই এসেছে ঘন প্রবৃদ্ধির দ্বারা। যে কারণে দেখা যাচ্ছে ২.৮ ভাগ প্রবৃদ্ধির পেছনে "প্রসারমান" জমির অবদান কমে গিয়ে হয়েছে .৯ ভাগ অর্থাৎ মাত্র শতকরা ৩২ ভাগ, পক্ষান্তরে "ফসল-বৃদ্ধির" অবদান বেড়ে হয়েছে ১.৯ ভাগ অর্থাৎ শতকরা ৬৮ ভাগ। সবচেয়ে নাটকীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় অদানাদার শস্যের ক্ষেত্রে। স্বাধীনতা পরবর্তীতে তাঁদের প্রবৃদ্ধির হার বস্তুত: ২.২ ভাগ থেকে কমে ০.৯ ভাগে পরিণত হয়। এর পধান কারণ হচ্ছে এই সময় অদানাদার শস্যের জমিতে ক্রমাগতদানাদার শস্য বপন করা হচ্ছিল। খাদ্য শস্যের চাহিদার চাপের মুখে অন্যান্য ফসলের বিশেষত: ডাল, তেলবীজ ইত্যাদির জমিগুলোকে কৃষকের এই সময় ধান-গম ফলন করেছেন। তাই বাস্তবে অদানাদার শস্যের অধীনে জমির পরিমাণ ১৯৭৩-৮৬ কালপর্বে .১ শতাংশ হারে হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু এরপরেও এদের উৎপাদন প্রবৃদ্ধির হার ইতিবাচক ছিল কারণ অল্প জমিতেও ফলন অনেক বেশি হয়েছিল। এই সময় অদানাদার শস্যের জমির একক প্রতি ফলনের গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১ শতাংশ। সেই হিসেবে বলা যায় যে, অদানাদার শস্যের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার আগে "প্রসারের দ্বারা প্রবৃদ্ধির" অবদান ছিল শতকরা ৫৯ ভাগ, কিন্তু স্বাধীনতার পর (১৯৭৩-৮৬) সেই অবদান নেতিবাচক হয়ে যায় অর্থাৎ শতকরা (-) ১১ ভাগ। পক্ষান্তরে স্বাধীনতার আগে "ঘনপ্রবৃদ্ধির" অবদান যেখানে ছিল শতকরা ৪১ ভাগ, স্বাধীনতার পর সেখানে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় শতকরা ১১১ ভাগ।

বর্তমানে বাংলাদেশে ফসল খাতের প্রবৃদ্ধি প্রধানত: নির্ভর করছে ফলন বৃদ্ধির উপর। তবে খাদ্য-শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য স্বাধীনতার পর "জমির" পরিমাণ বৃদ্ধি এখনো ইতিবাচক অবদান রাখছে- একথা সত্য।

সামগ্রিক বিচারে আমরা বলতে পারি যে, বর্তমানে বাংলাদেশে ফসল খাতের প্রবৃদ্ধি প্রধানত: নির্ভর করছে ফলন বৃদ্ধির উপর। তবে খাদ্য-শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য স্বাধীনতার পর "জমির" পরিমাণ বৃদ্ধি এখনো ইতিবাচক অবদান রাখছে- একথা সত্য। কিন্তু এই প্রবণতার ফল শুভ হবে না কারণ এর ফলে খাদ্যশস্য ছাড়া অন্যান্য শস্যের উৎপাদনের জন্য জমি হ্রাস পাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে ফসল উৎপাদনের বৈচিত্র্য হ্রাস পাবে, কৃষি আরও এক ফসলমুখী এবং খোরাকীমুখী, হয়ে পড়বে। অবশ্য জলসেচের মাধ্যমে চাষ তীব্রতা বৃদ্ধি করেও ধানী জমির (চাষকৃত) পরিমাণ বৃদ্ধি সম্ভব। সেক্ষেত্রে অন্য ফসলের জমি সরিয়ে আনার প্রয়োজন নাও হতে পারে।

আমাদের পরিমিত সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সম্ভাব্য দুটি হারই খাদ্য শস্যের অভ্যন্তরীন উৎপাদন বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি।

বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর দানাদার শস্যের প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়েছে। এই হার (২.৮ শতাংশ) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি ছিল। সেই হিসাবে মনে হতে পারে যে, দানাদার শস্যের প্রবৃদ্ধির এই হার ক্রমবর্ধমান খাদ্য শস্য চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, দানাদার শস্য তথা খাদ্য শস্য চাহিদা পূরনের জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, দানাদার শস্য তথা খাদ্য শস্যের প্রবৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হলেও স্বাধীনতা পরবর্তীতে তা আমাদের মোট খাদ্য চাহিদার তুলনায় সব সময়ই কম ছিল এবং উপরন্তু খাদ্য ঘাটতিও বিস্ময়করভাবে গড়ে প্রতি বছর এই সময়ে বেড়েই চলেছিল। সত্তর দশকের শেষ দিকে আমরা বিদেশ থেকে গড়ে ১.১২ মি: টন খাদ্য শস্য আমদানি করতাম। কিন্তু ১৯৮০-৮৫ সালে বাৎসরিক খাদ্য শস্য আমদানির পরিমাণ বেড়ে হয় ১.৭৭ মি: টন। পরবর্তীতে ১৯৮৬-৯০ সালের গড় আমদানির পরিমাণ আরও বেড়ে হয়েছিল ২.১৮ মি:টন। বস্তুত: এই সময় খাদ্য চাহিদা, খাদ্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হারের চেয়ে বাস্তবে বেশি হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। যদি আমরা ধরে নেই যে,

জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির হার এই সময় ছিল সর্বোচ্চ ২.৫ শতাংশ। তাহলে জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত খাদ্য-চাহিদা বৃদ্ধির হার ছিল ২.৫ শতাংশ। কিন্তু একই সময় আয় বৃদ্ধির প্রভাবের (Income effct) দরুনও খাদ্য চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময় খাদ্যশস্য চাহিদার আয় স্তিতিস্থাপকতা ছিল .৫৩ থেকে .৭৩ এবং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছিল শতকরা ১.৬ ভাগ হারে। এই হিসেবে আয় বৃদ্ধির প্রভাবে এই সময় খাদ্য চাহিদা বৃদ্ধি পাবে (১.৬×.৭৩) = ১.১৭ শতাংশ হারে। সুতরাং এই সময় সামগ্রিকভাবে খাদ্য শস্য বৃদ্ধির সর্বোচ্চ সম্ভাব্য হার ছিল ১.১৭+২.৫০ = ৩.৬৭ শতাংশ। আর যদি আমরা জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার কমিয়ে ১.৮ শতাংশ ধরি এবং খাদ্য শস্যের চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপককেও কমিয়ে .৫৩ ধরি। তাহলে আলোচ্য কালপর্বে (১৯৭৩-৮৬) খাদ্য শস্যের চাহিদার (estimated) সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সম্ভাব্য দুটি হারই, খাদ্য শস্যের অভ্যন্তরীন উৎপাদন বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি। সুতরাং স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭৩-৮৬ কালপর্বে খাদ্য শস্যের ক্রমবর্ধমান আমদানির ঘটনায় অবাক হওয়ার কোন কারণ নেই।

এক নজরে কৃষি পরিসংখ্যান

এক নজরে বাংলাদেশ কৃষি পরিসংখ্যান			
মোট পরিবার/খানা	:	২,৮৬,৯৫,৭৬৩	কৃষি শুমারি ২০০৮
মোট কৃষি পরিবার/খানা	:	১,৫১,৮৩,১৮৩	
কৃষি বর্হিভূত পরিবার/খানা	:	১,৩৫,১২,৫৮০	
মোট আবাদযোগ্য জমি	:	৮৫.৭৫ লক্ষ হেক্টর	কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ২০১৭, বিবিএস
মোট সেচকৃত জমি	:	৭৪.৪৮ লক্ষ হেক্টর	
আবাযোগ্য পতিত	:	২.২৩ লক্ষ হেক্টর	
ফসলের নিবিড়তা	:	১৯৪%	
এক ফসলি জমি	:	২২.৫৩ লক্ষ হেক্টর	
দুই ফসলি জমি	:	৩৯.১৪ লক্ষ হেক্টর	
তিন ফসলি জমি	:	১৭.৬৩ লক্ষ হেক্টর	
চার ফসলি জমি	:	০.১৭ লক্ষ হেক্টর	
নিট ফসলি জমি	:	৭৯.৪৭ লক্ষ হেক্টর	
মোট ফসলি জমি	:	১৫৪.৩৮ লক্ষ হেক্টর	
জিডিপিতে কৃষি খাতের	:	১৪.১০ (ছির মূল্যে	শ্রমশক্তির জরিপ ২০১৬-১৭,
অবদান	:	২০১৭-১৮ (p)	বিবিএস
জিডিপিতে শস্য খাতের অবদান	:	৭.৩৭ (স্থির মূল্যে)	
অবদান		২০১৭-১৮ (p)	
কৃষিতে নিয়োজত	:	৪০.৬	
জনশক্তি			

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদনের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই আসে ফসল উৎপাদন থেকে। আবার চাষকৃত জমির ৯৫ ভাগই দখল করে রেখেছে প্রধান প্রধান ৯টি ফসল। আবার এই ৯টি ফসলের ফসলের মধ্যে মাত্র দুইটি ফসল অর্থাৎ ধান ও গম একত্রে যাদেরকে বলা হয় দানাদার শস্য (Cereal Crops) এদের অধীনে রয়েছে চাষকৃত জমির (Cropped land) প্রায় ৮০ শতাংশ। সেই হিসেবে বলা যায় যে, বাংলাদেশের কৃষির প্রবৃদ্ধির মূলত: নির্ভর করে ফসল উপখাতের প্রবৃদ্ধির উপর এবং ফসল উপখাতের প্রবৃদ্ধি মূলত: নির্ভর করে দানাদার শস্য বা খাদ্যশস্যের উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির উপর। বাংলাদেশের প্রাক-স্বাধীনতা পরবর্তী উভয় আমলে কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধির পেছনে মূলত: কাজ করেছে জমির একক প্রতি ফলন বৃদ্ধির কৌশল। অর্থনীতির পরিভাষায় একে বলা হয় "ঘন-প্রবৃদ্ধি) (Intensive growth) কৌশল। কিন্তু এর মধ্যেও আবার লক্ষ্য করা যায় যে, ১৯৭৩-৮৬ কালপর্বে বাংলাদেশে খাদ্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে জলসেচের মাধ্যমেই শুধু ধানী জমির পরিমাণ বাড়ানো হয়নি, উপরোন্ত অদানাদার শস্য বিশেষত: ডালবীজ ও তেলবীজের অধীনস্থ জমি ধান চাষের জন্য রূপান্তরিতও করা হয়েছে। এই প্রবণতা বাংলাদেশের কৃষিকে অধিকতর "খোরাকীমুখী" (Subsistence oriented) এবং অ-বিচিত্র করে তুলেছে। এত কিছুর পরে খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ তো কমেই নি বরং তা আরো বেড়ে গেছে। সুতরাং ভবিষ্যতে কৃষির প্রবৃদ্ধির হার আরো বাড়াতে হবে এবং তা মূলত: "ঘন-প্রবৃদ্ধির" মাধ্যমে। পাশাপাশি খেয়াল রাখতে হবে যে, কৃষিখাতের বাজারযোগ্য উদ্বৃত্ত (Marketable surplus) এবং ফসল বৈচিত্র্য (Crop Diversity) আরো বৃদ্ধি করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন।

১. বাংলাদেশের কৃষিখাতের প্রবৃদ্ধি মূলত-
   ক. মৎস্য খাতের প্রবৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল; খ. ধান উৎপাদনের উপর নির্ভর করে;
   গ. গবাদী পশু উৎপাদনের উপর নির্ভর করে; ঘ. ফসল উপখাতের প্রবৃদ্ধির উপর নির্ভর করে।

২. বাংলাদেশের কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তি দু'টি হচ্ছে-
   ক. জমি এবং জল; খ. জমি এবং জমির একক প্রতি উৎপাদনশীলতা;
   গ. জমি, জল এবং জনগণ;

৩. বাংলাদেশে ১৯৭৩-৮৬ কালপর্বে ফসল উৎপাদনের গড় বাৎসরিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল-
   ক. ৩ শতাংশ; খ. ২.৫ শতাংশ; গ. ২.৮ শতাংশ ঘ. ২ শতাংশ

৪. বাংলাদেশের কৃষির বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-
   ক. খোরাকী মুখীনীতি; খ. বৈচিত্র্যহীনতা; গ. অ-বাণিজ্যিক; ঘ. ২ শতাংশ।

৫. ভবিষ্যতে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে-
   ক. খাদ্যশস্যের চাহিদা অন্যান্য শস্যের চাহিদার চেয়ে বেশি হারে বৃদ্ধি পাবে;
   খ. খাদ্য শস্যের চাহিদা প্রথমে তুলনামূলকভাবে বেশি বৃদ্ধি পেলেও পরে তা থিতিয়ে যাবে;
   গ. খাদ্য শস্যের চাহিদা জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমান হারে বৃদ্ধি পাবে।

৬. আমাদের খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির হার ২.৮ শতাংশ হওয়ার পরেও আমাদের খাদ্য ঘাটতি বেড়েছে কারন-
   ক. খাদ্য শস্যের চাহিদা জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে;
   খ. শুধু জনসংখ্যা বৃদ্ধি নয় আয় বৃদ্ধি ও খাদ্য শস্যের চাহিদা বৃদ্ধিতে ত্বরান্বিত করেছে;
   গ. জনসংখ্যা অধিকতর দ্রুত হারে বেড়েছে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১. আমাদের কৃষির ফসল বিন্যাস কি রকম?
২. খাদ্য শস্যের চাহিদা বৃদ্ধি কিসের উপর নির্ভর করে?

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. একবিংশ শতাব্দীর কৃষির জন্য বাংলাদেশের ভবিষ্যতে চ্যালেঞ্জগুলো এবং করণীয়গুলো কি?
২. বাংলাদেশের ফসল বিন্যাসকে কি "খোরাকীমুখী ও অ-বিচিত্র" বলা যায়? উত্তরের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করুন।
৩. "প্রসারের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি" ও "ঘনপ্রবৃদ্ধির" কৌশলের মধ্যে পার্থক্যগুলো কি? স্বাধীনতা পরবর্তীতে দানাদার ও অদানাদার শস্যের প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তি কি ছিল?

পাঠ ৩.৫ ঃ কৃষি খাতে সরকারী নীতিমালা

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- "সবুজ বিপ্লব" কি এবং কখন তা বাংলাদেশে চালু হয়েছিল;
- কিভাবে সবুজ বিপ্লব স্বাধীনতার পরেও সরকারী উদ্যোগে অব্যাহত থাকে;
- কখন তা অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক, পরিবেশ ও প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতাসমূহের মুখে শ্লথ হয়ে পড়ে;
- বিভিন্ন সরকারী পরিকল্পনার অধীনে কৃষিখাতে সরকারী আপেক্ষিক উন্নয়ন ব্যয় কিভাবে ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেয়েছে;
- কৃষির প্রবৃদ্ধির হারের উপর এর প্রতিফলন।

ষাট দশকের "সবুজ বিপ্লব" ও কৃষি নীতি

ষাট দশকে তদানীন্তন "পূর্ব পাকিস্তানে" সরকারী উদ্যোগে উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ প্রসারের যে অভিযান চালানো হয় পরবর্তীতে তাকেই "সবুজ বিপ্লব" নামে অভিহিত করা হয়েছিল। সমগ্র ষাট দশক জুড়ে এই "সবুজ বিপ্লবের" কৌশলই কৃষি খাতে অনুসৃত হয়েছে এবং এমনকি স্বাধীনতার পরেও সমগ্র সত্তর দশকে জুড়ে একই নীতিমালা অব্যাহত থাকে।

তথাকথিত "সবুজ বিপ্লবের" মূল উদ্যোগগুলো শুরু থেকেই ছিল রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভরশীল। উপর থেকে নেয়া এই সময়কার কৃষি অনুকুল নীতিগুলো ছিল-

ক. সরকারী প্রতিষ্ঠান বি.এ.ডি.সি (ষাট দশকে E.P.A.D.C) কর্তৃক ভর্তুকি দিয়ে কৃষকের কাছে স্বল্পমূল্যে বিভিন্ন কৃষি উপকরণ পৌঁছে দেয়া, যেমন-রাসায়নিক সার, উফশী বীজ, জলসেচ যন্ত্র, কীটনাশক ইত্যাদি।

খ. কৃষি গবেষণা ও কৃষি সম্প্রসারণের জন্য সরকারী উদ্যোগসমূহ যেমন- জয়দেবপুরের ধান/কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটসমূহের গবেষণা (BRRI, BARI) এছাড়াও কৃষি পাট ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে নিযুক্ত সম্প্রসারণ কর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি। অবশ্য ৬০ দশকের শুরুতে এসব কাজ পরীক্ষামূলকভাবে বা পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে প্রথম চালু হয়েছিল কুমিল্লায় (BARD) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

গ. বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলসেচের জন্য ড্রেন-খাল ইত্যাদি খননের জন্য পূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয় নান পাবলিক ওয়ার্কস। বিশেষত: সরকারী এজেন্সী BWDB (পূর্বের (W.A.P.D.A) প্রত্যক্ষভাবে এসব কাজের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিল।

ঘ. স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে কৃষকদের স্বল্পসুদে প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি ঋণ সরবরাহের জন্য সরকারী উদ্যেগে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক। অবশ্য স্বাধীনতার আগেও কৃষি ঋণ সরবরাহ করা হত সমবায় সমিতির মাধ্যমে।

উপরোক্ত নীতিগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

সরকারী উদ্যোগে কৃষি উপকরণ, কৃষি ঋণ এব জলসেচের ব্যবস্থা করে কৃষকদের উফশী প্রজাতির ধান-গম চাষে উৎসাহিত করা এবং তখন ভাবা হয়েছিল যে, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য অথবা অপ্রতুল জমিতে ফলন বাড়িয়ে কৃষির "ঘন-প্রবৃদ্ধি" সাধনের জন্য, এছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই। তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ ধরনের রাষ্ট্রনির্ভর তথাকথিত সবুজ বিপ্লবের কৌশল তখন খুবই জনপ্রিয় ছিল। তখন অবশ্য এর সম্ভাব্য পরিবেশ ও প্রতিবেশগত বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিয়ে কেউ কোন চিন্তা ভাবনা করার অবকাশ পায়নি। সম্ভাব্য খাদ্য সংকট ও দুর্ভিক্ষ এড়ানোর চিন্তাই ছিল তখন প্রধান চিন্তা।

সবুজ বিপ্লবের বিকাশের গতিপ্রবণতা

সবুজ বিপ্লবের মূল প্রযুক্তির রয়েছে তিনটি পরস্পর নির্ভরশীল উপাদান-

ক. জলসেচের ব্যবস্থা।

খ. উচ্চ ফলনশীল বীজ। এবং

গ. রাসায়নিক সার ও রাসায়নিক কীটনাশক।

এই তিনটি উপাদানের বিকাশের গতিপ্রবণতার বিবরণ ৩.৯ নং সারণীতে তুলে ধরা হলো।

সারণী ৩.৯ ঃ উফশী প্রযুক্তির বিকাশের গতিপ্রবণতা : ১৯৬৯-৭০-১৯৯৮-৯৯

বছর	চাষ তীব্রতা	নীট আবাদী জমির কত অংশ সেচায়িত	দানশস্যের অধীনে মোট জমির কত অংশ উফশী বীজের অধীনে (%)	মোট ব্যবহৃত রাসায়নিক সারের পরিমাণ (মি:টন)	ধানের উৎপাদনশীলতা (পাউন্ড/একর)
১৯৬৯-৭০	১.৫১	৩.৮	২.৭৬	০.২৮	১০০৩
১৯৭২-৭৩	১.৪২	১২.৩	১১.১০	০.৩৮	৯৫৩
১৯৭৬-৭৭	১.৪৮	১৬.৯	১৪.২	০.৫১	১১০২
১৯৮০-৮১	১.৫৪	১৮.৬	২৫.৪	০.৭৪	১১১৯
১৯৮৪-৮৫	১.৫৪	১৯.৭	৩১.৫	১.৪৩	১২২৭
১৯৮৮-৮৯	১.৬৮	৩২.৯	৩৮.৭	১.৬৯	১৩৫৪
১৯৯০-৯১	১.৭২	৩৫.৫	৪৪.১	২.০৮	১৫৪৪
১৯৯৮-৯৯	১.৭৫	৪৯	৬১	--	১৭৫১

উৎস: বি.বি.সি, স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইয়ার বুক, বিভিন্ন সংখ্যা।

সারণীতে প্রদত্ত তথ্য দেখা যায় যে, ১৯৬৯-৭০ থেকে ১৯৮৯-৯০ এই বিশ বছরে চাষতীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫ শতাংশ, মোট রাসায়নিক সার ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৬০০ শতাংশ, সেচায়িত জমির শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে ৮০০ শতাংশ এবং উফশী বীজের অধীনে জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩০০ শতাংশ। সর্বোপরি একর প্রতি ধানের ফলনও বৃদ্ধি পেয়েছে ৬৫ শতাংশ। সুতরাং এ কথা সুস্পষ্ট যে, "সবুজ বিপ্লবের" অনুকূলে গৃহীত নীতিমালা বাংলাদেশের কৃষকদের যথেষ্ট মাত্রায় প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছে। কৃষকেরা তাদের চিরায়ত বীজ প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং নিজেদের এক ফসলী জমিগুলোকে শুষ্ক মৌসুমে জলসেচের অধীনে এনে চাষযোগ্য করে সেখানে উফশী আবাদের প্রসার ঘটিয়েছেন। এই ঘটনা ধানের ফলন এবং মোট খাদ্যশস্যের ফলন

অনেকখানি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। এসব ইতিবাচক ফলাফলকে স্বীকার করে নিয়েও, সবুজ বিপ্লবের কতিপয় অনভিপ্রেত (Unintended) কুফলের দিকে নিচে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

ক. বাংলাদেশে "সবুজ বিপ্লবের" ভিত্তি ছিল উচ্চফলনশীল ধান বীজ। অন্যান্য ফসলের উচ্চ ফলনশীল বীজগুলো তখনও হয় আবিস্কৃত হয় নাই অথবা বাজারে সুলভ ছিল না। ফলে একচেটিয়াভাবে উফশী ধানের চাষ প্রসার লাভ করেছে বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের ফসল বৈচিত্র্য কমে বর্তমানে তা প্রায় এক ফসলী খাতে (Mono-crop Sector) পরিণত হয়েছে।

খ. ফসল বৈচিত্র্য কমার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশে অদানাদার শস্যের উৎপাদন ও সরবরাহ কমে গিয়েছে। বিশেষত: নানা ধরনের ডাল বীজ উৎপাদন বিপুলভাবে হ্রাস পাওয়ায়, গরীবের প্রোটিন 'ডাল' এর দাম এত বৃদ্ধি পেছে যে, তা নিম্নবিত্তের নাগালের বাইরে চলে গেছে। এর ফলে বিশেষত: নিম্নবিত্ত মানুষদের পুষ্টি সংরক্ষণে অসুবিধা ও ভারসাম্যহীনতা তৈরি হচ্ছে।

গ. আবার একই জমিতে উফশী অব্যাহত রাখলে, সার, কীটনাশক ইত্যাদি বাবদ নগদ উৎপাদন খরচ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। তদুপরি ১৯৮০-র পর থেকে সরকার দাতাদের চাপের মুখে এসব ক্ষেত্রে প্রদত্ত ভর্তুকী ক্রমাগত হ্রাস করার জন্যও উৎপাদন খরচ বেড়ে গেছে। পক্ষান্তরে খাদ্য বাজারে খাদ্যশস্যের দাম বিশেষত: চালের দাম বেড়ে গেলে দরিদ্র জনগোষ্ঠির বিক্ষোভ ও রাজনৈতিক সমস্যা বৃদ্ধি পাবে বলে সব সরকারই প্রচুর খাদ্য আমদানি করে বা রেশনে খাদ্য শস্য সরবরাহ করে বা খাদ্যের বিনিময়ে কাজের ব্যবস্থা করে চালের দাম নিম্নমাত্রায় স্থির রাখতে চেষ্টা করেছেন। ফলে সামগ্রিকভাবে কৃষকের ধানের দাম যে হারে বেড়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি হারে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষকের মুনাফার হার খুবই নিচে নেমে গেছে। বস্তুত: অনেকেই এখন কৃষি কাজকে যথেষ্ট লাভজনক ভাবেন না এবং কৃষি থেকে অন্য পেশায় চলে যেতে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন।

ঘ. সর্বশেষ বলা যায় যে, ১৯৯০ এর পর হঠাৎ করে কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধিতে একটা বড় ধ্বংস দেখা গিয়েছে। ১৯৭২/৭৩ থেকে ১৯৭৯/৮০ পর্যন্ত ধান উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল গড়ে প্রতি বচর ২.৭৯ শতাংশ হারে। ১৯৮৯/৮১ থেকে ১৯৮৯/৯০ সাল পর্যন্ত ঐ গড় বাৎসরিক বৃদ্ধির হার সামান্য হ্রাস পেয়ে হয় ২.৩২ শতাংশ। এবং যদিও ধানের ফলন বা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আমরা ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধির হারের থেকে বেঁচে গিয়েছিলাম, কিন্তু হতাশার দিক হচ্ছে এই যে, এই সময় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির গড় হার ছিল মাত্র ১.৪০ শতাংশ। অথচ ৭০ দশকে বা এমনকি ৮০-এর দশকেও ধানের উৎপাদনশীলতা গড়ে যথাক্রমে ২.৩১ এবং ২.৪৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

> যদিও ধানের ফলন বা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আমরা ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধির হারের থেকে বেঁচে গিয়েছিলাম, কিন্তু হতাশার দিক হচ্ছে এই যে, এই সময় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির গড় হার ছিল মাত্র ১.৪০ শতাংশ।

নব্বই দশকের শুরুতে ধান উৎপাদন তথা সমগ্র কৃষি খাতের নিম্নতর প্রবৃদ্ধির বিষয়টি নীতি-প্রণেতা সরকার ও দাতাগোষ্ঠীর মধ্যে বেশ গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে মোট তিন ধরনের মতামত ও ব্যাখ্যার সন্ধ্যান পাওয়া যায়-

পরিবেশবিদগণের মত

পরিবেশবিদগণ বহু আগে থেকেই সবুজ বিপ্লব বিশেষত: রাসায়নিক সারের ব্যবহারে ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাদের মতে "রাসায়নিক সার" উপর্যুপরী ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতা নষ্ট হয়ে যায় এবং তখন ক্রমাগত আরো বেশি বেশি সার ব্যবহার করে সমান উৎপাদন অক্ষুন্ন রাখতে হয়। আবার চিরায়ত ধানবীজগুলোর জীবনী শক্তি ল্যাবরেটরিতে তৈরি বীজের চেয়ে বেশি হওয়ায়, উফশী চাষের মড়ক সম্ভাবনাও বেশি থাকে এবং কীটনাশকের জন্য কিছু বাড়তি খরচের প্রয়োজন। হয়। আবার এসব রাসায়নিক উপাদান পানির সঙ্গে মিশে গেলে তা মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর জন্য ক্ষতি ডেকে আনে। মোদ্দাকথা দাঁড়াচ্ছে এই যে, "উফশী" প্রযুক্তি দীর্ঘদিন অব্যাহত থাকলে এক দিকে তার "ফলন" কমবে, অন্যদিকে তার উৎপাদন খরচ এবং বাহ্যিক বিরূপ প্রতিক্রিয়া (External Negative Reactions) আরো বৃদ্ধি পাবে। ফলে এক সময় উফশী প্রযুক্তির প্রসারই তার প্রসারকে আটকে দিবে। তাদের উপরোক্ত বিশ্লেষণ অনুযায়ী তারা অনেকেই এখন ভাবছেন যে, যা ছিল অনিবার্য তাই এখন বাংলাদেশে হচ্ছে।

"উফশী" প্রযুক্তি দীর্ঘদিন অব্যাহত থাকলে এক দিকে তার "ফলন" কমবে, অন্যদিকে তার উৎপাদন খরচ এবং বাহ্যিক বিরূপ প্রতিক্রিয়া আরো বৃদ্ধি পাবে।

প্রাতিষ্ঠানিক স্কুলের চিন্তাধারা

কোন কোন অর্থনীতিবিদ/সমাজতাত্ত্বিকরা মনে করেন যে, ৮০-র দশকের পর হঠাৎ করে সরকার সার, সেচযন্ত্র ইত্যাদি কৃষি উপকরণ থেকে ভর্তুকি হ্রাস করায় মধ্য ও গরীব চাষীরা বাজার থেকে প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়নি। তদুপরি বাজার অর্থনীতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এবং ব্যক্তিকরণের ফলে কৃষি উপকরণ ও কৃষি উৎপাদন উভয় বাজারেই ধনী চাষী ও ফড়িয়া ব্যবসায়ীদের একচেটিয়া আধিপত্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং সরকারী সহায়তা এক দিকে কমে গেছে, অন্যদিকে ব্যাপক কৃষক সমাজের বাজার থেকে উপকরণ সংগ্রহের ক্ষমতা বৃদ্ধি না পাওয়ায় উৎপাদনের অগ্রগতি ঘটছে না।

আমরা যদি সত্যিই সবুজ বিপ্লবের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে চাই তাহলে আজ আমাদেরকে পরিবেশগত বিরূপ প্রতিক্রিয়া হ্রাস, গরীব কৃষকদের প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক ও বৈজ্ঞানিক সমস্যাগুলো সমাধানের লক্ষ্যে একটি সম্মিলিত প্যাকেজ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

কৃষি বিজ্ঞানীদের মত

আসলে উফশী প্রযুক্তির প্রসারের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে জলসেচ, বন্যা-নিয়ন্ত্রণ এবং উচ্চ ফলনশীল বীজ। যেহেতু ইদানিং জলসেচ ও বন্যানিয়ন্ত্রণ খুব ব্যয়বহুল (কারণ প্রথমে সহজে প্রকল্পগুলো সমাধা করার পর এখন অবশিষ্ট প্রান্তিক প্রকল্পগুলো স্বাভাবিকভাবেই অপেক্ষাকৃত কঠিন ও দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে এবং আগে আবিষ্কৃত উচ্চ ফলনশীল বীজগুলোর প্রাথমিক কার্যকারিতা হ্রাস পেয়েছে। সেজন্য উফশী ভিত্তিক কৃষির প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে।

উপরোক্ত তিনটি মতেই সম্ভবত: কিছু কিছু সত্য বিদ্যমান। আমরা যদি সত্যিই সবুজ বিপ্লবের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে চাই তাহলে আজ আমাদেরকে পরিবেশগত বিরূপ প্রতিক্রিয়া হ্রাস, গরীব কৃষকদের প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক ও বৈজ্ঞানিক সমস্যাগুলো সমাধানের লক্ষ্যে একটি সম্মিলিত প্যাকেজ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

কৃষি খাতে সরকারী ব্যয়

বাজার অর্থনীতির প্রসারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কৃষি খাত থেকে সরকারের হাত গুটিয়ে নেয়ার মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কৃষিখাতে সরকারী ব্যয় তার আপেক্ষিক পরিমাণের ক্রমিক হাসের প্রবণতাটি এ বিষয়ে স্বাক্ষী দেয়। সারণী ৩.১০ সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যানগুলো তুলে ধরা হলো।

সারণী ৩.১০ ঃ কৃষির প্রবৃদ্ধি জি.ডি.পি-তে কৃষির অবদান এবং সরকারি উন্নয়ন ব্যয়ে কৃষির অংশ

বৎসর	কৃষির বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার	জি.ডি.পি-তে কৃষির অবদান (%)	সরকারি উন্নয়ন ব্যয়ে কৃষির অংশ (%)
১৯৭৩-৭৮	৪.৯	৫৭	৩১.২০
১৯৭৮-৮০	৩.১	৫২	২৮.৯০
১৯৮০-৮৫	৩.৫	৫১	২৯.৯০
১৯৮৫-৯০	১.৭	৩৯	২১.০০
১৯৯০-৯৫	০.৯৮	৩২.৮	১৯.৬০
১৯৯৬	৩.৭০	৩১.৯	২০.০৩
১৯৯৭	৬.০০	৩২.৪	২৩.২৯
১৯৯৭-২০০২ (প্রস্তাবিত)	৪.০০	২৫.৫	২৩.০০

উৎস: ৫ম-খসড়া পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা।

প্রদত্ত তথ্য থেকে দেখা যায় ১৯৭৩-৭৮, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধীনে কৃষি খাতে মোট সরকারী উন্নয়ন ব্যয়ের ৩১.২ শতাংশ ব্যয়ীত হয়েছিল। তখন জি.ডি.পি-তে কৃষি খাতের গড় অবদান ছিল ৫৭ শতাংশ। অথচ এর পর থেকে প্রতিটি পরিকল্পনায় কৃষিখাতে সরকারী উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ক্রামাগত হ্রাস পেয়েছে। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কৃষিখাতে সরকারী উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৯০-৯৫ সালে কৃষিখাতে এই বরাদ্দের মাত্রা দাঁড়িয়েছে মাত্র ১৯.৬ শতাংশ। যদিও ঐ সময় জি.ডি.পি-তে কৃষির গড় অবদানের হার ছিল ৩২.৮ শতাংশ।

অবশ্য ২০০০-২০০১ সালে কৃষিখাতে বরাদ্দের আপেক্ষিক হার পুনরায় সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। কারো কারো মতে, ১৯৯৫ এর পর কৃষিখাতে পুনরায় যে বর্ধিত প্রবৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তার কারণ তদানীন্তন সরকারের অনুসৃত আপেক্ষাকৃত অনুকুল কৃষি সহায়ক নীতিমালা (যেমন সারে ভর্তুকি, বিশেষ কৃষি ঋণ, সারের বাজার উপর থেকে সুশাসন, খাদ্যশস্যের দাম সমর্থন কৌশল ইত্যাদি)।

সারসংক্ষেপ

কৃষিখাতে সরকারী হস্তক্ষেপ ঔপনিবেশিক আমল থেকেই শুরু হয়েছে পাকিস্তান আমলে কুমিল্লার (BARD Bangladesh Academy of Rural Development) কে কেন্দ্র করে ষাট দশকে সমন্বিত পল্লী উন্নয়নের যে কৌশল সূচিত হয় পরবর্তীতে সেটাই শাখা প্রসাখা বিস্তারের মাধ্যমে "সবুজ বিপ্লব" কর্মসূচির অধীনে সরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন এজেন্সী বা সংস্থার মাধ্যমে কৃষকদের উফশী ধান চাষে উদ্বৃদ্ধ করার জন্যে বিভিন্ন কৃষি উপকরণ কৃষি বিষয়ক জ্ঞান ও পরামর্শ এবং সেচসেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। স্বাধীনতার পর ১৯৮০ সাল পর্যন্ত সরকার নির্ভর সবুজ বিপ্লবের এই কৌশল অব্যাহত ছিল।

কিন্তু "সবুজ বিপ্লবের" নিজস্ব কতকগুলো অর্থনৈতিক প্রাকৃতিক সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ছিল। ১৯৯০-এর প্রথম দিকে এই সীমাবদ্ধতাগুলো প্রকট হয়ে পড়ে এবং কৃষিখাতের প্রবৃদ্ধি প্রায় শূন্যের কাছাকাছি চলে আসে। অবশ্য ১৯৯৬ এর পর বর্ধিত সরকারী ব্যয়, সার খাতে আংশিক ভর্তুকি ও সার বাজারের নিবিড় আশার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সামগ্রিক বিচারে সরকারী কৃষি নীতির বর্তমান লক্ষ্য হচ্ছে খাদ্য নিরাপত্তা অক্ষুন্ন রাখার জন্য প্রয়োজনীয় মাত্রায় কৃষির প্রবৃদ্ধি, কৃষি উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান হারে বৈচিত্রায়ন ও বাণিজ্যায়ন এবং পরিবেশের বিরূপ প্রতিক্রিয়াসমূহ নিয়ন্ত্রণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন।

১. বাংলাদেশে "সবুজ বিপ্লবের" কৌশল গৃহীত হয়-

ক. ষাট দশকের গুরুর দিকে; খ. সত্তর দশকের গুরুর দিকে;

গ. আশির দশকের গুরুর দিকে; ঘ. পঞ্চাশ দশকের শুরুর দিকে।

২. সবুজ বিপ্লবের প্রধান তিনটি উপাদান হচ্ছে-

ক. বি.এ.ডি.সি; খ. বি.আই.ডব্লিউ.টি;

গ. বি.কে.বি; ঘ. সেচ, সার ও উন্নত বীজ

৩. "সবুজ বিপ্লবের' নীতির ফলে ১৯৭০-১৯৯০ কালপর্বে উফশী বীজের অধীনে জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে-

ক. ১৫০০ শতাংশ; খ. ১৪০০ শতাংশ;

গ. ১৩০০ শতাংশ; ঘ. ১৬৫ শতাংশ।

৪. সবুজ বিপ্লব আমাদের দেশে মূলত:

ক. দানাশস্যের উপর নির্ভরশীল; খ. অদানাদার শস্যের উপর নির্ভরশীল

গ. ধানের উপর নির্ভরশীল।

৫. "সবুজ বিপ্লবের" ফলে কৃষিখাতে বিনিয়োগের লাভজনকতা-

ক. ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে; খ. ক্রামগত বৃদ্ধি পেয়েছে;

গ. প্রথমে বৃদ্ধি পেলেও পরে ধীরে ধীরে কমে গিয়েছে; ঘ. একই রকম থেকে গিয়েছে।

৬. বাংলাদেশে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত কৃষি খাত সরকারী ব্যয়ের আপেক্ষিক প্রবণতা ছিল-

ক. ক্রমাগত নিম্নগামী খ. ক্রমাগত উর্ধ্বগামী;

গ. স্থির

৭. স্বাধীনতার পর ১৯৯০-৯৫ কালপর্বে বাংলাদেশের কৃষির গড় বাৎসরিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল-

ক. সর্বনিম্ন; খ. সর্বোচ্চ; গ. মাঝামাঝি।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. 'সবুজ বিপ্লব' কি?

২. কৃষি খাতে সরকারী ব্যয়ের গতি প্রবণতার পর্যালোচনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. "সবুজ বিপ্লব" এর নীতি কি কি কারণে ১৯৯০ দশকে শ্লথ প্রবৃদ্ধির দিকে ধাবিত হয়েছিল?

২. "সবুজ বিপ্লবের" অপরিহার্য উপাদানগুলো কি? কোন কোন সরকারী এজেন্সীর উদ্যোগ সেগুলো কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেয়া হতো?

পাঠ ৩.৬ ঃ বাংলাদেশে ভূমি সংস্কার ও কৃষি উন্নয়ন

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- অতীত প্রাক-স্বাধীনতা আমলে এবং স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক শাসনামলে কি ধরনের "কৃষি সংস্কারের" উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল;
- কৃষি সংস্কারের ফলাফল;
- বাংলাদেশে ভূমিহীনতা কিভাবে বর্তমানে আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে গিয়েছে;
- পুনর্বন্টনমূলক ভূমি সংস্কারের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতাগুলো।

বাংলাদেশে কৃষি সংস্কারের অতীত উদ্যোগসমূহ

কৃষি সংস্কার (Agrarian Reform) যদিও খুবই ব্যাপকার্থক শব্দ, এখানে আমরা একে সংক্ষিপ্ত অর্থে ব্যাখ্যা করবো। এখানে এর অর্থ হবে "ভূমি মালিকানায় পনর্বন্টন" এবং বর্গা প্রথার সংস্কার"। বাংলাদেশে অতীতে এই দুই ধরনের সংস্কার প্রচেষ্টাই গৃহীত হয়েছে। বস্তুত: সকল রাজনৈতিক সরকারই অন্তত: মুখে কোন না কোনভাবে ভূমি মালিকানার পুনর্বণ্টন তথা "ভূমি সংস্কার" এবং বর্গাপ্রথার সংস্কারের মৌখিক সমর্থন দিলেও কার্যকর কোন উদ্যোগের জন্ম দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

> মুসলিম জোতদাররা আইনের সুযোগ নিয়েই ভূমি-সিলিং এর আওতাতেই বৃহৎ ভূমিখন্ডের মালিক হয়ে বসেন এবং বৃহৎ পুঁজিবাদী খামার না গড়ে জমি পুনরায় ক্ষুদ্র ও ভূমিহীন চাষীদেরকে প্রতিকুল শর্তে বর্গা দিতে শুরু করেন। এভাবে জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হলেও বর্গা প্রথা তার স্থান দখল করে নেয়।

১৯৫০ সালে পাকিস্তানের আইন পরিষদে "ইস্ট বেঙ্গল স্টেট এ্যাকুইজিশন এ্যাক্ট" অনুমোদিত হয়। এই আইনের ফলে তদানীন্তত পূর্ব পাকিস্তানের খাজনাভোগী সকল বৃহৎ ভূস্বামীর (তখন তাদেরকে জমিদার বলা হত) এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের জমি অধিগ্রহণ (Confiscate) করে নেয়া হয়। অবশ্য আইন অনুযায়ী বৃহৎ ভূস্বামীরা তখন ৩৩.৩ একর পর্যন্ত অর্থাৎ ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমি নিজের মালিকানায় রাখতে পারতেন এবং জমি অধিগ্রহণ বাবদ তাদেরকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সামান্য পরিমাণে ক্ষতিপূরণ দানেরও ব্যবস্থা ছিল। এর ফলে বৃহৎ জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হল এবং ক্ষুদ্র ভূমি মালিকরা সরাসরি সরকারকে খাজনা প্রদানে সক্ষম হলেন। বস্তুত: আইন পাশ করার মাত্র এক বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৫৪ সাল নাগাদ তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানে জমিদারী প্রথা মোটামুটি উচ্ছেদ হয়ে গেল। এই বৈপ্লবিক পদক্ষেপের সাফল্যের পেছনে অন্যতম কারণ ছিল সরকারী দল মুসলিম লীগের সঙ্গে তদানীন্তন মূলত: পূর্ববঙ্গীয় হিন্দু জমিদার ও রাজাদের তীব্র দ্বন্দ্ব। কিন্তু আবার এই সাম্প্রদায়িকতার কারণেই হিন্দু জমিদাররা বিতাড়িত হলেও তাদেরকে তখন প্রতিস্থাপিত করে কতিপয় মুসলমান জোতদার। এই মুসলিম জোতদাররা আইনের সুযোগ নিয়েই ভূমি-সিলিং এর আওতাতেই বৃহৎ ভূমিখন্ডের মালিক হয়ে বসেন এবং বৃহৎ পুঁজিবাদী খামার না গড়ে জমি পুনরায় ক্ষুদ্র ও ভূমিহীন চাষীদেরকে প্রতিকুল শর্তে বর্গা দিতে শুরু করেন। এভাবে জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হলেও বর্গা প্রথা তার স্থান দখল করে নেয়। গবেষক আবু আব্দুল্লাহ্ ("ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড এগ্রিরাবিয়ান চেঞ্জ", বি.ডি.এস ভল্যুম (৪) নম্বর (১), ১৯৭৬ তার গবেষনায় দেখিয়েছেন যে, আসলে EBSATA-র ফলে গ্রামাঞ্চলে বৃহদায়তন হিন্দু জমিদারদের প্রতিস্থাপিত করেছে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মুসলিম জোতদারী প্রথা।

EBSATA-র আরেকটি সংশোধন করা হয় স্বাধীনতার আগেই ১৯৬১ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের অধীনে। এই সংশোধনীর ফলে ভূমি মালিকানায় সিলিং পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছিল ১২৫ একর বা ৩৭৫ বিঘায়। অবশ্য স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারিকৃত এক অধ্যাদেশের ফলে আওয়ামীলীগ সরকার ভূমি সিলিংকে পুনরায় ১০০ বিঘায় নামিয়ে আনেন। ১৯৭২'র অধ্যাদেশ অনুসারে ১০০ বিঘার বেশি উদ্বৃত্ত জমিগুলো তখন অধিগ্রহণ করে ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের (অর্থাৎ যাদের ভূমি মালিকানার পরিমাণ ১.৫ এককের কম) মধ্যে বন্টনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু আওয়ামীলীগের নির্বাচিত এম.পি-দের (বিশেষত: উত্তর বঙ্গের) প্রবল চাপের মুখে এই আইন কার্যকর করা সম্ভব হয় নাই। তদানীন্তন সরকার তখন চাপের মুখে নতি স্বীকার করে "পরিবারের" সংজ্ঞা এমনভাবে বদলে দেন যে, কার্যত: একটি পরিবারে যদি একাধিক পুত্র কন্যা থাকে তাহলে সেই পরিবারের প্রত্যেকের মাথাপিছু ১০০ বিঘা করে জমি রেখে দেওয়ার সুযোগ জমির মালিকরা পেয়ে গেলেন। ফলে সিলিং হ্রাস পেলেও পুনর্বন্টনের জন্য উদ্বৃত্ত জমি খুব একটা তখন পাওয়া যায় নাই। এভাবে পুনরায় "ভূমি সংস্কারের" কর্মসূচি একটি প্রহসনে পরিণত হয়।

১৯৭৫ সালে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার বাকশাল কর্মসূচীর ঘোষণা দেন। তিনি বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে জমির মালিকানা অক্ষুন্ন রেখে, কিন্তু জমির সীমানা (আইন) তুলে দিয়ে বাধ্যতামূলক যৌথ চাষের প্রবর্তনের প্রস্তাব দেন। তার প্রস্তাবানুযায়ী সরকার কৃষকদের প্রয়োজনীয় উৎপাদন উপকরণ সরবরাহ করবেন। মোট উৎপাদিত ফসল তিনভাগে বিভক্ত হবে। এক ভাগ জমির মালিকানা অনুসারে মালিকদের মধ্যে বন্টিত হবে। এক ভাগ শ্রমদাতারা শ্রমের পরিমাণ অনুযায়ী নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবেন এবং আরেক ভাগ সরকার উপকরণ সরবরাহকারী এজেন্টরা/কৃষকরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিবেন। এই ফর্মুলা ছিল অত্যন্ত অভিনব এবং বৈপ্লবিক। কিন্তু এই প্রস্তাবে কার্যকরী হওয়ার আগেই শেখ মুজিব ও তার পরিবারবর্গকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছিল এবং আওয়ামী লীগের দক্ষিণপন্থী অংশ ক্ষমতায় এসে বাকশালের কৃষি সংস্কার কর্মসূচীকে বাতিল ঘোষনা করেন।

ভূমি সংস্কারের সর্বশেষ উদ্যোগ গৃহীত হয় ১৯৮৪ সালে। সেই সময় ঘোষিত "ভূমিসংস্কার কর্মসূচির অধীনে জমির সিলিং ১০০ বিঘায় রাখা হলেও ঘোষনা করা হয় যে, যেসব পরিবারের জমি তখনও পর্যন্ত ৬০ বিঘার নিচে রয়ে গিয়েছিল, তারা জমি ক্রয় করে সর্বোচ্চ ৬০ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিক হতে পারবেন, এর বেশি নয়। অবশ্য ১০০ বিঘার বেশি জমি কারো থাকলে তা তৎক্ষণাৎ বাজেয়াপ্ত করার ঘোষনা দেওয়া হয়। এছাড়াও "বর্গাসংস্কারের" অধীনে ঘোষনা করা হয় যে, এখন থেকে বর্গাচাষী একবার জমি বর্গা চাষীর অধিকারকে ৫ বছরের জন্য নিরাপদ করা হয়। তাছাড়া আরো ঘোষনা দেওয়া হয় যে, যদি বর্গা চাষী স্বয়ং সমস্ত উৎপাদন খরচ বহন করেন, তাহলে উৎপাদিত ফসলের দুই তৃতীয়াংশ তিনি পাবেন এবং বর্গা মালিক খাজনা হিসেবে পাবেন উৎপাদনের এক তৃতীয়াংশ পক্ষান্তরে যদি ভূমি মালিক উৎপাদন খরচের অর্ধেক বহন করেন, তাহলে মোট ফসলের অর্ধেনক পাবেন বর্গা মালিক, অর্ধেক পাবেন বর্গাচাষী। কিন্তু বাস্তবে এসব আইন আদৌ কার্যকরী করা সম্ভব হয় নাই। বরং জেনারেল এরশাদের সামরিক সরকার প্রবল গণঅভ্যুত্থানের মুখে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।

বাংলাদেশে "ভূমিসংস্কার" ও "বর্গাসংস্কার" ঃ সর্বশেষ পরিস্থিতি

বাংলাদেশে এযাবৎ গৃহীত "ভূমিসংস্কার ও বর্গাসংস্কার" উদ্যোগের ফলে ভূমি মালিকানায় তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি বললেই চলে। ১৯৮৩-৮৪-র কৃষি শুমারি অনুসারে বাংলাদেশে ভূমি মালিকানার বিন্যাস ৩.১১ নং সারণীতে তুলে ধরা হল। সারণীর প্রদত্ত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র .৮ শতাংশ কৃষিজীবী খানা গ্রামাঞ্চলে ১৫ একরের বেশি জমির মালিক। সুতরাং ৩৩.৩ একর এর বেশি জমি বাংলাদেশে খুবই কম সংখ্যক গ্রামীণ পরিবারের মালিকানাধীন রয়েছে। আর ১৯৮৩-৮৪ সালের তুলনায় বর্তমান মালিকানা বৈষম্য খুব একটা কমে নি বলেই ধারণা করা যায়। সেই হিসেবে একথা বলা যায় যে, ৩৩.৩৩ একর সিলিং নীতি যদি কড়াকড়িভাবে কার্যকরীও হত তাহলেও যে উদ্বৃত্ত জমি উদ্ধার হত তাতে বাংলাদেশের গ্রামের নিচের দিকের ৫০ শতাংশ খানার (যাদের জমির পরিমাণ .৫ একরের কম।) জন্য প্রয়োজনীয় মাত্রার আদৌ পাওয়া যেত না। বাংলাদেশের অন্যতম কৃষি অর্থনীতিবিদ্ মাহাবুব হোসেনের ভাসায়, "একটি দেশে যেখানে গড় ভূমি মালিকানার পরিমাণ মাত্র ১.৫ একর, সেখানে ৩৩.৩ একরকে ভুমি মালিকানার সর্বোচ্চ সিলিং ধরাটা একটি প্রহসন বৈ অন্যকিছু নয়। এটি নেহায়েত একটি লোক দেখানো আইন, যা দিয়ে রাজনীতিবিদ্‌রা নিরক্ষর জনগণকে 'বুঝ' (Pacify) দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন।" ড. মাহাবুব হোসেন, ১৯৯৫]

সারণী ৩.১১ ঃ ভূমি মালিকানার বিন্যাস ১৯৮৩-৮৪

ভূমি মালিকানার আয়তন (একর)	পরিবারের সংখ্যা (০০০)	শতাংশ
০.০৫ এর কম	২৫০৩	১৮.১
০.০৫-০.৪৯	৩৮৯৫	২৮.২
০.৫০-০.৯৯	১৬৬০	১২.০
১.০০-২.৪৯	২৯৭৯	২১.৬
২.৫০-৪.৯৯	১৫৯৮	১১.৬
৫.০০-৭.৪৯	৬৫০	৪.৭
৭.৫০-১৪.৯৯	৪১৫	৩.০
১৫.০০ এবং উর্দ্ধে	১১৭	০.৮
মোট	১৩৮১৮	১০০

উৎস : কৃষি শুমারী, ১৯৮৩-৮৪।

১৯৯৬ সালের সর্বশেষ কৃষি শুমারি থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে ভূমিহীন খানার সংখ্যাও এদিকে আরো আশঙ্কাজনক মাত্রায় বেড়ে গেছে। প্রাথমিক প্রকাশিত তথ্যে বলা হয়েছে ১৯৮৩-৮৪ সালে সম্পূর্ণ ভূমিহীনদের সংখ্যা যে জায়গায় ছিল ১.২ মিলিয়ন, ১৯৯৬ এ তা হয়েছে ২.১০ মিলিয়ন। আপেক্ষিক গুরুত্বের হিসাবে এই পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৮ শতাংশ (১৯৮৩-৮৪) থেকে ১২ শতাংশ (১৯৮৩-৯৪) পরিণত হয়েছে। যদি আমরা ভূমিহীনতাকে অপেক্ষাকৃত উদারভাবে সংজ্ঞায়িত করি তাহলে কার্যত: ভূমিহীন খানা যাদের মালিকানাধীন মোট জমির পরিমাণ ০.৫ একরের কম, তাদের সংখ্যা ১৯৮৩-৮৪ সালে ছিল মাত্র ৩.৭ মি: কিন্তু মাত্র ১২ বছরে তা বেড়ে

১৯৯৬ সালে দাঁড়িয়েছে ৬.৪ মিলিয়ন। আপেক্ষিক গুরুত্বের হিসাবে ১৯৮৩-৮৪ সালে এদের গুরুত্ব ছিল গ্রামীন সকল প্রকার খানার ৫৬ শতাংশ, আর ১৯৯৬-এ তা দাঁড়িয়েছে ৬০ শতাংশ।

১৯৯৬ এর কৃষি শুমারির আরেকটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার (Finding) হচ্ছে ঃ অকৃষকায়নের (Depeasantisation) ক্রমবর্ধমান প্রবণতা। প্রকাশিত তথ্যানুসারে ১৯৮৩/৮৪-১৯৯৬ কালপর্বে যদিও গ্রামীন খানার মোট সংখ্যা ২৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল, কিন্তু ঐ একই কালপর্বে কৃষিজীবী খানার মোট সংখ্যা বৃদ্ধি তো পায়নি বরং তাদের চূড়ান্ত মান (Absolute Number) এই সময় হ্রাস পেয়েছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে গ্রামে কৃষিজীবীখানার সংখ্যা ছিল ১৪.৫ মিলিয়ন, কিন্তু ১৯৯৬-এ হিসাবকৃত পরিমাণটি হচ্ছে মাত্র ১১.১ মিলিয়ন। ১৯৮৩-৮৪ সালে গ্রামে অকৃষিজীবী খানার আপেক্ষিক গুরুত্ব ছিল মাত্র ২৮ শতাংশ, পক্ষান্তরে ১৯৯৬ সালে এই গুরুত্ব দাঁড়িয়েছে ৩৭ শতাংশ। এসব তথ্য থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায়, গ্রামাঞ্চলে যে আর্থ-সামাজিক গতিশীলতা বিদ্যমান তার ফলে আমাদের দেশে নিঃস্বকরণ, ভূমিহীনতা, অকৃষকায়ণ, দারিদ্রায়ন ইত্যাদি প্রবণতা এখনো বেশ জোরে শোরেই বিদ্যমান। এখানে ভূমিহীনতা আজ এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়েছে যে, পুনর্বন্টনমূলক ভূমিসংস্কারের দ্বারা সকল ভূমিহীন পরিবারকে বর্তমানে জমি দিতে হলে, জিমির সিলিং অত্যন্ত নিচুতে নামিয়ে আনতে হবে। বর্তমান মধ্যবিত্ত রাজনৈতিক কর্তৃত্বে তা দুরূহ। এমনকি বামপন্থী রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অধীনেও নিছক পুনর্বন্টনমূলক ভূমি সংস্কার দ্বারা গ্রামীণ দারিদ্র্যের নিরসন ঘটানো কঠিন। সম্ভবত: চীনা কায়দায় বাংলাদেশে বৈপ্লবিক ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে গ্রামীন ক্ষমতা কাঠামো ভেঙ্গে দিতে পারলে নিম্নতর স্তরের জনগণকে দিয়ে কৃষি ও অকৃষি উভয় খাতেই উৎপাদন বৃদ্ধির যে আয়োজন ও উৎসাহ সৃষ্টি করা সম্ভব হত সেটাই বাংলাদেশের ভবিষ্যত দারিদ্র্যমুক্তির অন্যতম পন্থা হতে পারে। কিন্তু সে ধরনের রাজনৈতিক পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে অতীতে 'ভূমি মালিকানার পুনর্বন্টন' এবং 'বর্গা প্রথার সংস্কার'-এই দুই ধরনের সংস্কার প্রচেষ্টাই গৃহীত হয়েছে। ১৯৭৫ সালে সরকার বাকশাল কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এই কর্মসূচি প্রস্তাব ছিল সরকার কৃষকদের প্রয়োজনীয় উৎপাদন উপকরণ সরবরাহ করবেন। এবং কৃষকরা তাদের জমি, শ্রম এবং আংশিক উৎপাদন উপকরণ সরবরাহ করবেন। ১৯৮৪ সালে ভূমি সংস্কারের সর্বশেষ উদ্যোগ গৃহীত হয়। সেই সময় ঘোষিত 'ভূমি সংস্কার' কর্মসূচির অধীনে জমির সিলিং ১০০ বিঘার নিচে রয়ে গিয়েছিল, তারা জমি ক্রয় করে সর্বোচ্চ ৬০ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিক হতে পারবেন, এর বেশি নয়। অবশ্য ১০০ বিঘার বেশি জমি কারো থাকলে তা তৎক্ষনাৎ বাজেয়াপ্ত করার ঘোষণা দেওয়া হয়। এছাড়াও বর্গা সংস্কারের অধীনে ঘোষণা করা হয় যে, বর্গাচাষী একবার জমি বর্গা নিলে তাকে ৫ বছরের আগে ঐ জমি থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না। ১৯৯৬ সালের সর্বশেষ কৃষি শুমারি থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে ভূমিহীন থানার সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গিয়েছে। এই শুমারির আরেকটি উল্লেকযোগ্য আবিষ্কার হচ্ছে- অকৃষকায়নের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা। ১৯৮৩-৮৪ সালে গ্রাম অকৃষিজীবী থানার আপেক্ষিক গুরুত্ব ছিল মাত্র ২৮ শতাংশ, পক্ষান্তরে ১৯৯৬ সালে এই গুরুত্ব দাঁড়িয়েছে ৩৭ শতাংশ। এসব তথ্য থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায় যে, গ্রামাঞ্চলে যে আর্থ সামাজিক গতিশীলতা বিদ্যমান তার ফলে আমাদের দেশে নি:স্বকরণ, ভূমিহীনতা, অকৃষকায়ন, দারিদ্রায়ন ইত্যাদির প্রবণতা এখনো বেশ জোরে সোরেই বিদ্যমান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন।

১. পুনর্বন্টনমূলক ভূমিসংস্কার বলতে বোঝায়-

ক. জমির সর্বোচ্চ সিলিং ঘোষনা করা; খ. সিলিং উদ্বৃত্ত জমি অধিগ্রহণ করা;

গ. উদ্ধারকৃত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে পুনর্বন্টন করা; ঘ. উপরোক্ত সবগুলো।

২. বর্গাসংস্কারের অর্থ হচ্ছে-

ক. বর্গা মালিকের অনুকুলে বর্গার শর্তাবলীর সংস্কার;

খ. বর্গা-চাষীর অনুকুলে বর্গার শর্তাবলীর সংস্কার;

গ. বর্গার বদলে চুক্তি প্রথার প্রচলনকে উৎসাহিত করা।

৩. বাংলাদেশে জমিদারী উচ্ছেদ হয়েছিল-

ক. ১৯৭২ সালে; খ. ১৯৮৩ সালে;

গ. ১৯৫০ সালে; ঘ. ১৯৫২ সালে।

৪. বাংলাদেশে আয়ুবী আমলে ভূমি সিলিং ছিল-

ক. প্রথমে ১৭৫ বিঘা পরে ১০০ বিঘা; খ. প্রথমে ১০০ বিঘা পরে ৩৭৫ বিঘা;
গ. সর্বদাই ১০০ বিঘা।

৫. বাংলাদেশে আয়ুবী আমলে ভূমি সিলিং ছিল-
ক. এই সিলিং ছিল খুবই উঁচু;
খ. এই সিলিং কার্যকরী করার আগে পরিবারের সংজ্ঞা বদলে দেয়া হয়েছিল;
গ. এই 'সিলিং' ঠিক মত কার্যকরী করা হয়নি।

৬. এরশাদ সরকার প্রণীত আইন অনুসারে বর্গাচাষীরা একবার জমি বর্গা নিলে তার তা রাখতে পারবেন-
ক. সর্বোচ্চ ১০ বছরের জন্য; খ. সর্বোচ্চ ৫ বছরের জন্য;
গ. কমপক্ষে ৫ বছরের জন্য; ঘ. কমপক্ষে ১০ বছরের জন্য।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. ১৯০০ সালের "ইস্ট বেঙ্গল স্টেট একুইজিশন" আইনটি কি?
২. বাংলাদেশে "ভূমিপুনর্বন্টন" ও "বর্গাসংস্কারের" প্রধান কাম্য ফলাফল কি হতে পারে?